কান্না হাসির দোলা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

এক

তাসের কেল্লা

জয়ন্তের সংগে যেদিন আমার প্রথম দেখা হয় সেদিনটি ছিল প্রতিদিনের মতোই অ-সাধারণ ও অনাড়ম্বর।

জীবনে সে এক অপূর্ব মুহূর্ত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বে কোথাও এতটুকু ইঙ্গিত ছিলনা যে, জীবনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। পুরাতন জীবনের ফেলে-আসা দিনগুলির সংগে আগামী কালের প্রভাতের আর কোনো সাদৃশ্যই থাকবে না।

মাঝে মাঝে তাই এই দিনটির কথা ভাবি, যদি কিছু খুঁজে পাই।

শীতের সকাল। ঘুমটা সকালের দিকেই জমে বেশী। দাসী সরোজিনী এসে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল, ওর জ্বালায় ঘুমোবার উপায় নেই। চায়ের পেয়ালার আওয়াজ ক'রে, সশব্দে দরজা খুলে বা বন্ধ ক'রে, ঘরের জানালার সাশী খুলে দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়।

আমি বললাম—সরো, তুই দিন দিন বড় বাড়াবাড়ি করে তুলেছিস্, এত বেশী হট্টগোল করিস্ একটু ঘুমুতেও পারিনা।—যা পালা—

এই বাড়ীতে সরোজিনীর আধিপত্য দীর্ঘকালের। ওর প্রকৃতির সংগে আমার পরিচয় আছে। ও শুধু মৃদু গলায় বলল—ওঠো গো দিদিমণি, ওঠো, এমন সকালটা আর শুয়ে কাটিয়ো না। বাইরে বেশ ঝির ঝিরে বাতাস বইছে—

আমি গর্জন করে বললাম—বাতাস বইছে তা আমার কি ? বেরো, বেরো বলছি—

সরোজিনীর কিন্তু এ কথায় কান নেই। সে ঘরের এক কোণ থেকে আমার একপাটি স্লিপার কুড়িয়ে নিয়ে গজ গজ করছে—এমন ধিংগি মেয়েও দেখিনি বাপু! কোনো জিনিষের গোছ নেই। আর একপাটি কই—?

না কোনো উপায় নেই দেখছি। যতক্ষণ না আমার ঘুম ভালো ক'রে ভাঙ্গে ও যাবে না। তাই হাই তুলতে তুলতে উঠে বসলাম। বললাম—নিচে ড্রয়িংরুমটা একবার খুঁজে দেখিস্, কি জানি, কি যে হয়—চা কই ?

—বাসিমুখেই চা খাবে নাকি ? দিন দিন যে কুঁড়ের সর্দার হয়ে উঠলে গো—

সত্যই বড় কুঁড়ে হয়ে উঠছি দিন দিন। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসলাম। সরোজিনী আমার মুখের দিকে ভ্রুভঙ্গী ক'রে চাইতে গিয়ে চোখে চোখ পড়তেই হেসে মুখ নামিয়ে নিল। বল্‌ল—উঠে পড়, আমি স্নানের বন্দোবস্ত করিগে—

সরোজিনী চ'লে যাওয়ার পর আমি আবার বিছানায় শুয়ে গড়াতে লাগলাম। অকারণ আলস্যের ঘোর যেন আর কাটে না। সারাদিনে কত কাজ আছে, কি কি করতে হবে, এই চিন্তাই মনটাকে আচ্ছন্ন ক'রে তুলেছিল। সকালেই গোলাপ হালদারের বাড়ি যাবার কথা আছে। সেখানে কথাবার্তা সেরে বাড়ি ফিরে ফের মার সংগে একবার কলেজ স্ট্রীটের দিকে বেরিয়ে কিছু কেনা-কাটা আছে। তারপর আর কিছু মনে নেই। কোথাও যেন একটা ফাঁক রয়েছে। কিছু কাজ আছেই—কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না—

পিছন ফিরে সেই প্রভাতের প্রতি খুঁটি-নাটির কথা স্মরণ ক'রে এখন ভাবি, আশ্চর্য কিছু ঘটবে, একটা এই রকম ঘটনা হবে, তারই লক্ষণ যেন সর্বত্র ছিল। নইলে আমি, সাধারণতঃ সব কিছুই সহজে যে ভোলেনা, কিছুতেই কেন তার মনে পড়ল না সেই সন্ধ্যায় কোথায় যেতে হবে।

বালিস দুটো পিঠের কাছে জড়ো ক'রে বসে ভাবতে লাগলাম, গোলাপ হালদারের সংগেই কি কোথাও যাবার কথা আছে ?

লোকটির কথা মনে এল। রোগা, লম্বা, শ্যামবর্ণ, রুক্ষ আকৃতি, বেশ-বাসে একটা সতর্ক শৈথিল্য। পৈত্রিক ব্যবসা হালদার এ্যাণ্ড কোম্পানীতে এখন কাজকর্ম করছেন। কেমন ক'রে ব্যবসা করতে হয়, কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রিত করতে হয় এই সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। আমার কিন্তু মনে হ'ত না যে, উনি কিছু শিখেছেন।

তার সংগে তখন আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা। এমন কি মাঝে মাঝে মনে হ'ত যে, আমি ওর প্রেমে পড়েছি। অনেক সময় উভয়ে একত্রেই কাটাতাম। বিশেষতঃ টেনিসের লনে। স্থির করেছি দু চারদিনের জন্য একত্রে কোথাও বেড়িয়ে আসব, সে সংকল্প কিন্তু আজো কার্যকরী হয়ে উঠেনি। কাটাবার মত ওজরের শরণাপন্ন হতে হয়েছে উভয়কেই। আসল কারণ হ'ল (আর সে কারণ এমনই প্রচ্ছন্ন যে, আমরাই ঠিকমত জানতাম না বা বুঝতাম না), একত্রে কয়দিন কাটানোর দুঃসাহস আমাদের কারো নেই।

যে কথা স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম তার সংগে কিন্তু গোলাপ হালদারের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই মন থেকে তার কথা সহজেই মুছে গেল।

এমন সময় সহসা মনে হ'ল শেফালীদের কথা।

মার দূর সম্পর্কের বোন শেফালীর মা। তাহ'লেও আমি কিছুই জানতাম না ওদের সম্বন্ধে। একদিন শেফালীর মার সঙ্গে সামনাসামনি পড়ে গেলেন মা— চৌরঙ্গীর কাছে।

সেই আমাদের প্রথম পরিচয়।

মার আমন্ত্রণে শেফালী আর ওর মা একদিন আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলেন। আমাদের বাগান দেখবার জন্য শেফালীর আগ্রহ দেখে আমিই ওকে বাগানে টেনে নিয়ে এলাম।

আমাদের সামনে সৌন্দর্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। অসংখ্য রঙিন ফুলের সে কি বাহার! চন্দ্রমল্লিকা ফুটেছে প্রতিটি টবে একটি ক'রে। আকারে বড়, রঙে প্রত্যেকটি বিভিন্ন। যেন কাগজের তৈরী।

শেফালী অবাক্ হয়ে গিছল এই সব শোভা ও সৌন্দর্যের সমারোহে। আমার মনে আছে ওর পরণে ছিল ফলসা রঙের একখানি সাধারণ খদ্দরের শাড়ি আর পায়ে দেশী চপ্পল। তার পাশে আমি, গায়ে টাঙ্গাইল শাড়ি আর পায়ে হোয়াইটওয়ের কেনা বিলাতি সু। কিন্তু বেশে-বাসে এতখানি অনাড়ম্বরত্ব থাকা সত্ত্বেও ওকেই যেন ভালো দেখাচ্ছিল।

ভালো লাগছিল না, তবু আমরা একত্রে ঘাসের উপর বেড়ালাম কিছুক্ষণ। শেফালীর বহুবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল, আমি পালটা প্রশ্নও কিছু করলাম। তখন কিছুই বুঝিনি, কিন্তু সেই মুহূর্ত আজো অবিস্মরণীয়। ধূলি-মলিন জীবনের শেষ দিন পযন্ত সেকথা মনে সজাগ ও সতেজ হয়ে থাকবে। সেই কালে বুঝিনি, এখন কিন্তু বুঝি যে, আমার পোষাকী চাকচিক্যের 'স্নবারি' ভেদ ক'রে শেফালীর দৃষ্টি পড়েছিল আমার অন্তরের অন্তঃস্তলে—

এই খানেই আমার নবজীবনের সূত্রপাত—

চন্দ্রমল্লিকার টবগুলির সামনে এসে শেফালী দাঁড়িয়ে পড়ল। এমনই লঘু স্বচ্ছন্দ গতিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মনে হ'ল, আমাদের এই মাটির সংসারে, কৃত্রিম পরিবেশের ভিতর যেন কোনও দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। কোনো কারণ না থাকলেও আমি কেমন কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগলাম। ওর উপস্থিতিতে আমি যেন সহসা অতি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হয়ে গেছি।

এইখানেই শেফালী যখন ওদের বাড়ি যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো, হঠাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার আপত্তি করার শক্তি রইল না। হয়ত নিভৃত হৃদয়-কোণে যেখানে আমাদের সহস্র সমস্যার সহজ সিদ্ধান্ত হয়, যেখানে প্রকৃত বাসনা ধরা পড়ে, সেইখানেই আমার অবচেতন মন শেফালীর আমন্ত্রণে সায় দিয়ে বসল।

বুঝলাম আমাকে যেতেই হবে।

নীচের তলায় নেমে দেখলাম বাইরের বারান্দায় ব'সে বাবা চা খাচ্ছেন, সামনে যথারীতি সংবাদপত্রখানি খোলা রয়েছে। আর যদিও তিনি পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন, স্পষ্ট বুঝলাম, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো জটিল রাজনৈতিক সমস্যার চিন্তাতেই তাঁর মন আচ্ছন্ন।

ওঁর পাশে গিয়ে বসতেই খবরের কাগজ থেকে মুখটি একবার তুলে বললেন—

"এই যে বসো মা—"

সেই সকালেই বাবার গা থেকে চুরুটের গন্ধ বেরোচ্ছে—বাবার সংগে গন্ধটাও যেন জড়িয়ে আছে। আমি নীরবে বসে এক পেয়ালা চা ঢেলে নিয়ে চুমুক দিলাম। বাবার উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছে না—যেন পাথরের মূর্তির পাশে বসে আছি।

আমার কাছে বাবার যেন আর মূল্য নেই।

এমনই প্রস্তরময় হয়ে আছেন উনি। সকালে এই সময়টুকু আর রাত্রে খাবার সময় যা দেখা যায়। আমার খরচ-খরচা ও অভাব-অভিযোগের প্রয়োজন মেটাতেই তাঁর প্রয়োজন অনুভব করি। তিনি যে ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ, কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েছেন, অনাগত ভবিষ্যতের সংশয়াচ্ছন্ন দিনগুলির আতংকে ম্রিয়মাণ, আমার সান্নিধ্য ও স্নেহ ভোগ করার জন্য ব্যাকুল—এ সব কথা আমার ধারণাতীত ছিল। এমনই বাবার প্রকৃতি আরো অনেকের মতো মনের কথা কোনোদিন উনি মুখে প্রকাশ করতেন না।

কিছুক্ষণ পরে মা এলেন। সেই সকালেই সাজ-সজ্জার অভাব নেই, মুখটি ফোটাফুলের মতো মাধুর্য-মণ্ডিত। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মা বললেন—খুকী বুঝি আজ খুব ভোরে উঠেছিস—?

মার এই প্রশ্নের জবাবে আমি শুধু একটু হাসলাম। মা এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে বাংলা খবরের কাগজটি নেহাৎ তাচ্ছিল্যভরে টেনে নিলেন।

বাইরে নূতন জীবনের প্রচণ্ড প্রেরণায় পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে রঙ আর রূপের সমারোহ সুরু হয়েছে। প্রভাতী সূর্য-কিরণের প্রাথমিক স্পর্শ ক্রমশঃই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

কিন্তু প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করার মতো প্রবৃত্তি আমাদের কারো ছিল না। আমরা আমাদের নিয়েই মসগুল।

এখন মাঝে মাঝে পিছন ফিরে সেদিনের কথা ভাবি। ভাবি কি ক'রে সম্ভব হয়েছিল এত কাছে থেকেও তিনটি প্রাণী কেউ কারো মনের কথা জানতো না, অন্তরের যোগাযোগ কারো ভিতরই ছিল না, এতখানি অন্তরঙ্গত্বের ভিতর এতবড় ফাঁক আর ফাঁকি আজ কল্পনাতীত। কিন্তু সেদিন তাই সম্ভব ছিল।

যে যার ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়েই আমরা সকলে এত বিব্রত থাকতাম যে, অপরের কথা জানবার বা চিন্তা করবার অবসর থাকতো না।

বহির্জগৎ ব'লে আমার কাছে কিছু ছিল না, জানতাম বটে সাদা, কালো, পীত, —দরিদ্র, দুঃস্থ, অসুস্থ, দুর্গত লোকজনে পৃথিবী পরিপূর্ণ। জানতাম লোকে বনের পশুপক্ষীর অধম হয়েও ইঁদুরের গর্তের মতো ছোট খুপরীতে অসংখ্য পুত্র-কন্যা নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করে। বস্তীতে বস্তীতে উইপোকার সারের মতো ইতর নর-নারীর ভিড়—কখনো কখনো সে দিকে চোখও পড়েছে। কিন্তু ওদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না।

জানতাম ওদের বিষয় মাও কিছু জানতেন না, জানা প্রয়োজন মনে করতেন না। কারণ তাঁর উন্নততর জীবন-ধারার ভিতর এই সব দুর্গতদের চিন্তা কিছুতেই তিনি প্রবেশ করতে দিতেন না।

বাবার মতো মারও প্রকৃতি স্বভাব-ভীরু, কিন্তু বাবা যখন টাকা—আরো টাকার সন্ধানে জীবনউৎসর্গ ক'রে দিলেন, মা-ও অপর দিকে শাড়ী, গাড়ি, থিয়েটার, সিনেমা, পার্টি আর পরচর্চায় আত্মোৎসর্গ করলেন।

আগে বুঝতাম না মা-ও মানসিক শংকাকে প্রবঞ্চনা করার জন্যই এই পথ

ধরেছেন। দশ বছর পরে জেনেছি ও বুঝেছি। তারপর সব কিছুই স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে গ্রহণ ক'রে মেনে নিয়েছি। আমার জগৎ, আমার নিজস্ব গণ্ডী, যে জগতের পরিধিতে আমার জন্ম, তার আবেষ্টনী সুদৃঢ়, বনিয়াদ পাকা, অদম্য ও আরামদায়ক। সেই শান্ত নির্ভরযোগ্য পরিবেশের দৃঢ় ও স্থিতিমান গণ্ডীতেই নিজের তাসের কেল্লা রচনা করেছিলাম।

বাবার চা পান শেষ হ'ল, মা তখনও টোস্টের টুক্‌রোয় কামড় দিচ্ছেন ও সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রেখেছেন। বাবা বললেন: আজ আর ফিরবো না, একবার খড়্গপুর যেতে হবে—।

মা উদাসীন ভংগীতে শুধু মাথা নাড়লেন।

বাবা পুনরায় বললেন: আমার বাথরুমের ট্যাপটা খারাপ হয়েছে বোধ হয়। কি জানি কি হয়েছে, একবার ওদের ডাকিয়ে—

মা প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে? কি করতে হবে?

বাবা বিরক্ত হ'য়ে বলে উঠলেন—কি হয়ে উঠছো দিন দিন? এই সব ছোট-খাটো ব্যাপারও কেউ দেখচে না, আমাকেই কি সব করতে হবে?

মা হাই তুলে সংবাদপত্রটি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললেন—সিলি! আমি ত' আর প্লামবার নই, এ সব কথা সরকারকে ডেকে বলা উচিত—'

—তাকে বলার ইচ্ছে নেই আমার, সে শুধু এ বাড়ীর একজন কর্মচারী।

—কর্মচারীকে কাজ করার জন্যই রাখা হয়েছে, বসে থাকার জন্য নয়।

বাবা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—গড্—তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে চলে গেলেন।

মা মুখখানি ঈষৎ বিকৃত ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—মিছিমিছি দেরী হয়ে গেল। চৌধুরীদের বাড়ি সাড়ে দশটায় আমাদের উইমেন্স্ ক্লাবের মিটিং—

—কিন্তু বিকাল পাঁচটায় মালতীমাসিদের ওখানে যাবার কথা রয়েছে যে—?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ত', আমি একেবারে ভুলেই গিছলাম, আমিও [illegible] ব্যস্ত থাকবো খুব, তোমার দ্বারিক কাকা আসচেন—

কথাটা ভারী বিশ্রী লাগলো আমার। এই দ্বারিক কাকাটিকে আমি মোটেই পছন্দ করি না! বেশ বুঝি আমাদের সাংসারিক অশান্তির পিছনে এই ধূমকেতু সদৃশ প্রাণীটির উপস্থিতি একটি হেতু।

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে মা বললেন—অত আকাশ-পাতাল ভাবছিস্ কি—?

—না ভাববো আবার কি, অমনই। মা অতঃপর চলে যেতে যেতে বললেন—আচ্ছা এখন ত' চলি, পরের কথা পরে হবে—।

মা চলে গেলেন, আমি রৌদ্র-কিরণ তপ্ত বারান্দার সেই কোণটিতে নিঃশব্দে বসে রইলাম।

দশটার পর গোলাপ হালদার এসে হাজির। বাগানের ভিতর টু-সিটার কারখানি ঢুকিয়ে ওখান থেকেই ইলেকট্রিক হর্ণের শব্দে চারিদিক মুখরিত ক'রে তুলল।

—হ্যালো—মিনিতাই—

হ্যালো—ব'লে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম। আজ হালদারের চোখদুটি ভারী উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, একটা নূতন ভংগী ওর চোখ-মুখে—যেন ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে একটা মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেছে।

আমি উঠে বসতেই হালদার গাড়ীতে আবার স্টার্ট দিল।

নানাবিধ কথার ভিতর সহসা হালদার ব'লে উঠল—কি হ'ল আমাদের গিরিডি যাবার? আমি আবার এই মাসের শেষের দিকে শ্রীনগর যাচ্ছি, কিছুদিন থাকতে হবে সেখানে।

কথাটি কানে ভালো শোনালো না, কিন্তু যদিও দীর্ঘকাল ধ'রে এই বেড়াতে

যাওয়ার কথাটি আমাদের মনে মনে দোদুল্যমান তবু হালদার যখন আজ সোজা-সুজি কথাটা পেড়ে ফেলল তখন মনে হ'ল আমার বুকে কে যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত করলো—

এই মুহূর্তটিও আমার মনে গভীর দাগ রেখে গেছে।

হাতের আঙুলগুলিতে সূর্যকিরণের তাপ এসে লাগছে, আর তার পাশে গোলাপের উপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করলাম—আমি ও গোলাপ যেন এক ভিন্ন জগতে, নূতন পরিবেশে চলে গেছি—

গোলাপ পুনরায় প্রশ্ন করল—কি যাবে না ?

আমার অন্তরে প্রথম বাসনা যে বলি 'হ্যাঁ'—কিন্তু কিছুতেই মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে পারলাম না। কেন এমন হয়! কতবার ভেবেছি সম্মতি জানাই, কিন্তু প্রতিবারই দুস্তর লজ্জা এসে বাধা দিয়েছে। হয় ত' গোলাপ আমাকে দাম্ভিক ভাবছে, কিংবা ভাবছে লজ্জাবতী লতা—কেন যে আমি আর সকলের মত স্পষ্ট কথা বলতে পারি না তাই ভাবি—

সহসা অন্তরে সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেললাম—বেশ এইবার যাওয়া যাবে—

ভাবলাম ও চমকিত হয়ে উঠবে—কিন্তু ওর মুখে এতটুকু প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না, ও শুধু মৃদু গলায় বললে :—কবে—?

—কালই—

—আচ্ছা—দশটার পর তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।

সামনে দিয়ে একখানি মোটর অত্যন্ত মৃদুগতিতে চলে গেল। গাড়ীতে একটি মহিলা বসে ছিলেন—আমাব দিকে তার সে কি তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি। যদি অন্তর্লোকে তাঁর দৃষ্টি যেত তাহ'লে হয়ত বুঝতেন গাড়ীতে শুধু দুটি সাধারণ তরুণ-তরুণী বসে নেই, আমার অন্তরে যে ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে তার কিঞ্চিৎ আভাস পেতেন।

গোলাপ তার শক্ত সবল হাত দিয়ে আমার ক্ষীণ মুঠি চেপে ধরল—

মা ফিরলেন অনেক দেরীতে।

জানতুম ওঁর এমনই দেরী হবে—তবু যখন দেখলাম উনি আসছেন না, তখন আমি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছি, একশোবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর তাঁর সংগে কখনো কোথাও যাবোনা। কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা আমি কোনোদিন রাখতে পারিনি।

মা ফিরলেন যখন তখন তিনটে বেজে পনের হয়েছে। আমার বার বার শুধু গোপালের কথা মনে হ'তে লাগল—কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গিছলাম আমি গোলাপের স্পর্শে—

কিন্তু যখনই গিরিডি যাবার কথা মনে হ'ল তখনই আবার ভাবান্তর ঘটলো। ভাবতে লাগলাম, মানুষের জীবন কেমন সহসা কত সামান্য কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটু লজ্জা, সামান্য অস্পষ্টতা, কিঞ্চিৎ কুণ্ঠা, জীবনের সমস্ত ধারা বদলে দেয়—সত্যের কাছাকাছি পৌঁছেও আমরা অসত্যটাই বরণ ক'রে নিই।

সেদিন অপরাহ্ণে যদি গোলাপকে টেলিফোনে ডেকে বলতে পারতাম—'সরি, আমার একটু ইযে—' আর মজার কথা এই আমাকে বাধা দেবার ত' কিছুই ছিল না। টেলিফোনের বা চিঠির অন্তরালে ত' কত কথাই বলা চলে। না হয় গোলাপ একটু চটতো—

কিন্তু তা পারলাম না,—

বিকাল ছটার ভিতর বাথরুমে বসে ভাবতে লাগলাম কেন মরতে যে মালতী মাসিদের মহেশতলার বাড়িতে যেতে হবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কেউ ভাবতে পারে? ক্ষণিকের দুর্বলতায় কথা দিয়ে ফেলেছি। ওদের বাড়িতেও ত' একটা খবর দিয়ে দিলেই হ'ত যে যেতে পারবে না। কিন্তু তাও আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। কিছুক্ষণের ভিতরই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ শাড়িটা পরা উচিত তাই চিন্তা করতে লাগলাম।

এই এক সমস্যা—কথনো ওদের বাড়ি যাইনি, কি ধরণের লোকজন আসবে কে জানে। মা বলেন মহেশতলা একটা ভুতুড়ে দেশ। উনি আগে আগে গিয়েছেন। অতি পুরাতন বাড়ি। বনেদি ধরণের সেকেলে বাড়ি। আগে ওদের জমিদারীর আয় কমে যাওয়ায় অবস্থা বেশ খাবাপ হয়েছিল—এখন নাকি মালতী মাসিব স্বামী চৌধুরী মেসোমশাই জাহাজের কি সব মালপত্তর সরবরাহ ক'রে একটু দাঁড়িয়েছেন। আর দাঁড়িয়েছেনই বা কি, মহেশতলার বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এখনও বাসা বাঁধতে পারেন নি। তাই চৌধুরী-কর্তা ইংরেজী আমলের গোড়াব দিকে যে "মহেশতলা ভবন" তৈরী করেছিলেন সেই বাড়িতেই ওঁরা এখনো আছেন। মা বলেন আজকাল নাকি এই ধরণের এত বড় বাড়ি সচরাচব চোখে পড়ে না।

ওদিকে ঠাণ্ডা বেশী। কারণ শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরের পথ। কাজেই পাতলা জামা-কাপড পরা চলবে না, অথচ ওদেব বাড়ী খুব জাঁকজমক ক'রে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।

সরোজিনী আমাদের বাড়ির সবময়ী কর্ত্রী। সে বল্‌ল—পাতলা ফিকে সবুজ শাড়িটা পরে যাও না বাপু, ওভারকোটটা সংগে নিয়ে যাও। শীত করে গায়ে দেবে, নইলে গাড়িতে রেখে যাবে।

আমি আন্‌মনাভাবে বললাম, বেশ তাই হবে—সবোজিনী আবার ব'লে ওঠে—ঠাণ্ডা লাগিয়ে একটা অসুখ বিসুখ বাধিয়ে বসো না যেন—

—আমার যাবার একবিন্দু ইচ্ছে নেই, কেন যে না ভেবে চিন্তে কথা দিয়ে বসলুম।

—তাতে আর হয়েছে কি, চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছো। দেখবে যতটা খারাপ ভাবছো ততটা বাজে নয়। নতুন জায়গা দেখতে পাবে ত'।

—নিশ্চয়ই, বাজে। যতসব বুড়ো-হাবড়ার দল। মা যাবে বলেছিল, এখন পিছু হটছে—

সরোজিনী কথা চাপা দিয়ে বলল—ভারী চমৎকার মানিয়েছে এই শাড়িটাতে—

—তবে আর কি, স্বর্গে চ'লে গেলুম একেবারে—

—স্বগ্‌গে কেন যাবে? যেখানে যাবার, ঠিক সেখানেই যাবে।

সরোজিনী আমাকে বাল্যকাল থেকে মানুষ করছে, আমার প্রকৃতি ওর বিশেষ ভাবেই জানা আছে। আজ এই সন্ধ্যায় আমার যে বাইরে যাবার এতটুকু বাসনা নেই, সেই প্রচ্ছন্ন মনোভাব ওর চোখেও ধরা পড়েছে—

আমার ভাল লাগছিল না। সহসা কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি জগৎ থেকে—

হরি সিং সজোরে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছে। নিস্তব্ধ জনহীন পথে সবেগে বিরাট গাড়িখানি ছুটে চলেছে—দু'পাশে বড় বড় দেবদারু গাছের সার, নতুন পাতা দেখা দিয়েছে, সান্ধ্য আকাশের ছিন্ন মেঘের ফাঁকে শুক্লপক্ষেব এক ফালি বাঁকা চাঁদ দেখা যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবী নবজীবনেব গানে মুখরিত। আমি যেন কোথায় কোন্ নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছি, অকারণের উদ্দেশে ভেসে চলেছি—বর্তমানের নিস্তরঙ্গ জীবন, ভবিষ্যতের হাতে নূতন রূপে, নবীন বেশে আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করছে।

দুই

মহেশতলা ভবন

হরি সিং যখন 'মহেশতলা ভবনে'র সামনে গাড়ি এনে দাঁড করালো তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। অন্ধকার তখনও তেমন ঘনীভূত হয়নি—আমি সোজা বাগান পেরিয়ে পুরাণো ধরণের সিঁড়ি বেয়ে সদব দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়লাম। নীচের তুটি ঘর থেকে আলো ভেসে আসছে, আর ওপরের একটা খোলা জানলা থেকে এক ঝিলিক হাসির হর্‌রা শোনা গেল। আমার ডাক ভিতর থেকে শোনা যায়নি বোঝা গেল, কেন না কেউ এসে দোর খুলে দিল না, অথচ কাজের বাড়ি। সেই মুহূর্তে আপনাকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হ'ল। হরি সিং গাড়ি নিয়ে অদূরে ছায়ামূর্তিব মত দাঁড়িয়ে। সামনে ধূসর সন্ধ্যার পটভূমিতে অপরিচিত একটি সুবিশাল বাড়ি, আর তার ভিতরে অপরিচিতদের এক অজ্ঞাত জগৎ।

ছায়াচ্ছন্ন বাগানটি থেকে প্রথম বসন্তের মধুর গন্ধ ভেসে আসছে। বাতাসে বসন্ত রজনীর মদিরতা। অদূরে কোথায় একটা পাখি কিছুক্ষণ ডেকে থেমে গেল—আরো দূর থেকে ভেসে এল ঠাকুর বাড়ির শাঁখ-ঘণ্টার আওয়াজ।

কিন্তু আমার কাছে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি বা পাখির ডাকের কি মূল্য? এই গ্রাম্য মাসিমার কি অপরিসীম অভব্যতা। কি হিসাবে তিনি আমাকে এ ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? এঁদের কি কোনো দাসী চাকর নেই? কান নেই? ভদ্রতা-জ্ঞান নেই?

পুনরায় দরজায় আঘাত করলাম, এবার যদি সাড়া না পাই, মনে মনে স্থির করলাম, তাহ'লে সোজা গাড়িতে গিয়ে বসব, আর ডাকলে যাদের সাড়া পাওয়া যায় এমন বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দেব।

এইবার কিন্তু ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল, আমি উৎসাহভরে চেয়ে রইলাম, কাউকে দেখতে পাব মনে ক'রেই। কিছুই কিন্তু দেখতে পেলাম না, সেই মুহূর্তে সহসা আমার কেমন মনে হ'ল দরজাটি কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে খুলে গেল। কিন্তু সে ধারণা সাময়িক, কারণ দোদুল্যমান কেরোসিন লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোয় একটি সজীব প্রাণীর উপস্থিতি বোঝা গেল।

প্রথমটা ভাবলাম কোনো ছোট ছেলে বুঝি, কিন্তু আলোটা চোখে সয়ে যেতে সবিস্ময়ে দেখলাম যেন ওয়াল্ট্ ডিজনের ছবি থেকে সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন অদ্ভুত এক ক্ষুদ্রাকৃতি বৃদ্ধ। লোকটির মাথাটি আমার কাঁধ অবধি হবে, আর তাতে এক গাছিও চুল নেই। শুকনো মুখের প্রান্তরেখা ক্ষীণ পাকা দাড়িতে বোঝা যায়—মুখের দিকে কিছুক্ষণ ভালো ক'রে দেখার পর লোকটির দন্তহীন মুখে যেন স্মিত হাসি দেখা গেল, তারপর শোনা গেল—আসুন, আপনার একটু বিলম্ব হয়ে গেল—

কথায় মেদিনীপুর জেলার টান।

আমি তবুও ইতস্ততঃ করছি দেখে বৃদ্ধ আমার মুখের পানে তাকিয়ে ব'লে উঠল—কি, গাড়ির কথা ভাবছেন? ও আমি বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।

আমি শান্ত ভাবে বললাম—না, তা নয়, আমার সোফার ওখানে আছে তাকে একটু ব'লে দিলেই হবে—'

লোকটির দিকে তাকাতেই কেমন একটা অস্বস্তিকর ভয়ে আমার গা ছম্ ছম্ ক'রে উঠল—

—আচ্ছা আমি দেখছি আপনি চলুন, ওদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে—

সামনে একখানি বড় ঘরের দরজা খুলে এক ঝলক আলো ভেসে এল আর মধুর কণ্ঠে কে ডাকলো—বৃ ন্দা ব ন।

স্বর শুনেই বুঝলাম মালতী মাসিমার কণ্ঠস্বর, তিনি এদিকে আসছেন।

আমাকে দেখেই খুসী হয়ে এগিয়ে এসে বললেন—আরে মিনতি যে—এসো, এসো—'

মাসিমা আমার মুখটি ধ'রে চুমু খেতে গেলেন, আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। মাসিমা বুঝলেন লজ্জায়, আমি কিন্তু স্পর্শ-দোষ এড়ানোর জন্যই পিছিয়েছিলাম।

বৃন্দাবনটির দিকে মাসিমার লক্ষ্যই নেই। পাশাপাশি যাবার সময় আমাকে মৃদু গলায় বললেন ওর দিকে তাকিয়ো না—ও এ বাড়ির জানলা-দরজার মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তোমার মেসোমশাইকে তাই বলি! ও বোধ হয় ভাবে 'মহেশতলা' ভবনের মালিক ও স্বয়ং। এখানকার সকলেই অবশ্য ওকে জানে, তবে কি জানো মা, নতুন লোক ওকে দেখে অবাক্ হয়ে যায়, ভয় পায়।

আমি বললাম—তা ছাড়া এই সব গ্রামাঞ্চলে চাকর-বাকর পাওয়া ত' সহজ নয়—'

এই ভেবে কথাটা বললাম যে নইলে এই অদ্ভুত জীবটিকে এঁরা রেখেছেন কেন!

মাসিমা হেসে বললেন—রাখা না-রাখার প্রশ্ন নয় মা, ও এখানে সেই সাত বছর বয়স থেকে আছে, তখনকার কালের কাগজ-পত্রে আছে। তখন এসেছিল গরু দেখবে ব'লে রাখালের কাজ নিয়ে, আর ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মাত্র দু' টাকা মাইনেতে কাজ করেছে। লোকটি ভালো। তারপর মাসিমা বললেন, —আমাদের ত' ড্রেসিং রুম নেই মিনতি, এই ছোট ঘরটি আজকের মত ড্রেসিং ঘর করেছি। যদি কিছু দরকার থাকে তোমার ত' যেতে পার—পাউডার স্নো সব আছে—

মনে ভাবলাম, বাজার থেকে স্টেশনারী দোকানের সস্তা পাউডার আর বাজারের স্নো আজকের এই বিশেষ দিনটির জন্য হয়ত কিনে আনা হয়েছে—মুখে বললাম—না মাসিমা, আমার কিছু দরকার নেই—

মাসিমা তখনো তাঁর সেই বৃন্দাবন নামক

বলছেন—ও চলে গেলে কি যে হবে আমাদের তাই ভাবি আমি। প্রায় আশী বছর বয়স হ'ল, ও অবশ্য বলে ষাট। ইদানীং একটু রোগাও হয়েছে, বৃন্দাবন-হীন এ বাড়ি ত' কল্পনাতীত।

আমি মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম আর কতক্ষণ উনি এভাবে একটা অথর্ব চাকরের কাহিনী শোনাবেন। এমন সময় দরজা দিয়ে এক ঝলক হাসির মত বেরিয়ে এল শেফালী। বললে—এই যে মিনতি! তুমি শেষ অবধি যে আসবে ভাবতেও পারিনি, বৃন্দাবনের কাছে শুনে এত আনন্দ হচ্ছে—

আমিও খুসী মনে বলে উঠলাম—এই যে, তোমাকেই ত' খুজছি। হ্যাপি বার্থ ডে,—এই ব'লে আমার হাতের মোড়ক দুটি ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম তোমার জন্মদিনের জন্য সামান্য কিছু উপহার—

ঐখানে দাঁড়িয়েই শেফালী মোড়কের কাগজ খুলতে লাগল।—শেফালী একখানি শান্তিপুরী জরীপাড় সাধারণ শাড়ি পরেছে। ব্লাউজটা এখানকারই কোনও দরজীর হাতের তৈরী, মুখে তেমন রঙ নেই, গালে নেই রুজ, তবু ওকে কি অপূর্ব সুন্দরীই না দেখাচ্ছে, স্বাভাবিক তরঙ্গায়িত চুলে যত্ন ক'রে এলো-খোঁপা বেঁধেছে, দু' চারটি মাত্র গহনা। বেশী বাড়াবাড়ি কোথাও নেই, খোঁপার উপর গুঁজেছে কয়েকটি শুভ্র রজনীগন্ধা—স্বীকার করতে হ'ল মনে মনে, হ্যাঁ শেফালীর রূপ আছে বটে। রঙ নয়, সমারোহ নয়, সাজসজ্জার পারিপাট্য নয়, প্রকৃতিতে এমন কিছু একটা বৈশিষ্ট্য ওর আছে যার জন্য ওকে এত মনোহর দেখায়।

ভেলভেটের খাপ খুলে নূতন প্যাটার্নের সোনার দুল দেখে বিস্ময়-বিমূঢ় শেফালী আবেগভরে শুধু বলল—মিনতি!—একি করেছ ভাই—'

মুগ্ধ নয়ন মেলে শেফালী ওর মার মুখের দিকে তাকাল। এই প্রথম বুঝলাম মা ও মেয়ের আকৃতিতে কতখানি মিল আছে।

শেফালী আমাকে আবার বলল—ছিঃ ছিঃ এ ভারী অন্যায় হ'ল—তারপর মার দেওয়া শাড়ির বাক্সটি খুলে শেফালীর বিস্ময় আরো বেড়ে গেল—

আমি বললাম—তাড়াতাড়িতে মা বিশেষ কিছু দিতে পারলেন না—

মাসিমা বাধা দিয়ে বললেন—আর কি দেবেন ?

—দেখ দিকিনি, মিছি মিছি কতগুলি টাকা খরচ হয়ে গেল—সত্যি বলছি মিনতি, এরকম শাড়ী আমার একখানাও নেই।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার এই প্রকাশে আমার মনটা খুসী হ'ল। আমি আর কি বলব, একটু মৃদু হাসলাম মাত্র।

এই বিশ্রী আবহাওয়া দূর করার জন্যই বোধকরি মালতী মাসি বললেন—ওকে তোরা একটু বসতে দিবি নি। এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি ? ওদিকে খাবারও তৈরী—এই বেলা না বসলে আবার মুস্কিল হবে, ওকেও ত' আবার ফিরতে হবে।

মহেশতলায় সেই প্রথম রাত্রে চৌধুরীদের দেখে আমার মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, সে কথা আজ এতদিন পরে মনে রাখা শক্ত। তবে তাদের কথা এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে মন থেকে মুছে ফেলাও সহজ নয়।

মনে আছে আমি মালতী মাসিমার পিছনে একটি প্রাচীন ধরণের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম—আমার পিছনে শেফালী, এবং আরো দু' একজন কে যেন ছিল। এইখান থেকে প্রাচীন পূজার দালান দেখা যায়, ঠিক যে ভাবে চৌধুরী-কর্তা দেড়শ বছর আগে তৈরী ক'রে গেছেন সে রকমই আছে। কাঠের সিঁড়ির ওপর পায়রার আবজনার স্তূপ। পূজার দালানে একটি আলো মিট মিট ক'রে জ্বলছে, সেই ম্লান আলোকে দেখা গেল পূজার দালানে অনেকগুলি সিঁদুর-মাখানো মাটির ভাঁড় রয়েছে। আর সিঁড়ির শেষ প্রান্তে উঠে দেখি সেই বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটি তেমনই নীচু ক'রে, হাত দুটি পিছনে মোড়া, কি যেন বিড় বিড় ক'রে বকছে, গঙ্গাস্নানান্তে মোক্ষকামী বৃদ্ধ যেন মন্ত্রোচ্চারণ করছেন।

আমাদের পায়ের আওয়াজ শুনে লোকটি মালতী মাসির মুখের দিকে সরোষে তাকাল—বলল—ছিঃ ছিঃ—খালি নষ্ট আর অপচয়। যা পছন্দ করি না তাই। কি না কলকাতা থেকে একটা ধিংগি মেয়ে এসেছে—মাথা কিনেছেন—।

আমি ত' অবাক! রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল। মনে হ'ল চেঁচিয়ে বলি—এখনই আমি কলকাতায় ফিরে যাব, কিন্তু সেই মুহূর্তেই শেফালীর কোমল আঙ্গুলগুলি আমার হাতে মৃদু চাপ দিল।

মাসিমা অত্যন্ত মৃদু গলায় বললেন—ওকে নিয়ে পারা যায় না মা, ও অমনি বকে, ওর কথায় কান দিও না। তারপর একটু জোর গলায় বললেন—ঠিক আছে, বৃন্দাবন, তুমি আমাদের খাবার দেওয়াবার বন্দোবস্ত কর। দিদিমনি আবার আজই ফিরে যাবেন—

আর একটিও কথা না ব'লে তিনি আমাদের নিয়ে বারান্দার পাশের একটি প্রশস্ত ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন—বললেন—এই দেখ মিনতি এসেছে, আমার বীণাদির মেয়ে। অনেক দিন ওরা বাইরে ছিল তাই দেখা-শুনা নেই,—কিন্তু বেশীক্ষণ গল্প চলবে না, বৃন্দাবন আবার তাড়া লাগাচ্ছে—

এই আলোর সমারোহ আর অপরিচিতের ভীড়ের ভিতর থেকে স্পষ্টই বুঝলাম কয়েকটি প্রাণী আমার দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার পিঠে হাত রাখল। সচকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি গৌরবর্ণ এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, মাথা জোড়া টাক, বললেন—একটু সরবৎ—

মালতী বাধা দিয়ে বললেন—এখন সরবৎ খাবে কি বল? এখনই খাবার দেওয়া হচ্ছে—'

ভদ্রলোকটি বললেন—আমি তোমার মেসোমশাই, গোপীনাথ চৌধুরী—

একবার ভাবলাম পায়ের ধুলো নিতে হবে নাকি, কিন্তু অভ্যাস বশতঃ কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলাম—তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর হাত থেকে সরবতের গ্লাসটি তুলে নিলাম।

চৌধুরী মেসোমশাই বললেন—তোমাকে এঁরা বড় তাড়া দিচ্ছেন না মা? কি করা যায়, এঁরা সবাই বৃন্দাবনের ভয়ে আধমরা হয়ে আছেন—,

কথাটির ভিতর হয়ত প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল, সকল বিষয়েই এই বৃন্দাবনটিকে নিয়ে

টানাটানি দেখে শুধু বিস্মিত নয় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলাম। খাবার তাড়া কারণ বৃন্দাবন চটবে, বৃন্দাবন অতিথিকে অপমান করবে, চুপ, চুপ! কি না একটা পুরাতন চাকর, এ বাড়ীর প্রাচীন রাখাল।

ইতিমধ্যে মালতী মাসির অপব ছেলেরা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—সবাই বেশ স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী। ভালো ছেলে মার্কা চেহারা। তাদের পাশেই শেফালীর চেয়ে ছোট্ট একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, বুঝলাম শেফালীর ছোট বোন—

দলের মধ্যে বয়স্ক ছেলেটি এগিয়ে এসে বল্‌ল—আমি রমানাথ—শেফালীর বড়দা—

তার পরেরটি অতঃপর এগিয়ে এল—তার নাম জানা গেল—সোমনাথ।

ভাবছি আমি কি অভিনয় দেখছি, না অভিনয় করছি—রঙ্গমঞ্চে যেন একে একে এক একটি পাত্র-পাত্রীর আবির্ভাব ঘটছে—

এমনই হয়ত চল্‌ত আরো কিছু কাল। মালতী মাসিমা এবার গলার স্বর কিঞ্চিৎ বাড়িয়ে বললেন—এস সবাই, খাবার দেওয়া হয়েছে।—

কয়েকদিন পরে আমার এই মহেশতলা দর্শন বিষয়ে জয়ন্তর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। চৌধুরী পরিবারের সম্পর্কে আমার কি ধারণা জন্মেছিল, আর সেই কথা বলায় উনি কি বলেছিলেন, সে কথা আমার আজো স্মরণে আছে। উনি বলেছিলেন, আমাদের অনেকের মতো তুমি যা দেখতে চেয়েছিলে, যা দেখার আশা ক'রে গিছলে তা দেখেছ। আগে থেকেই তোমার দৃষ্টি ছিল ঝাপসা—তুমি কতকগুলো অদ্ভুত ছেলে মেয়ে দেখবে, আশা ক'রে গিছলে, দেখেছও তাই। বাকি সবই কুয়াশায় ঢাকা ছিল, সেই কুয়াশা কাটিয়ে দেখার চেষ্টাও তুমি করোনি, প্রকৃত পক্ষে তারা যে কি তা তুমি বুঝতে পারোনি—

বলেছিলাম—বুঝতে স্থরু করেছিলাম কিন্তু,—

একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন—তবু তোমার বনেদীয়ানার উন্নাসিক

লৌহ প্রাচীর ভেদ ক'রে ওদের সারল্যের সুর গ্রহণ করতে পারোনি, রক্ষণশীল মনোবৃত্তির বাইরে যাবে কি ক'রে ?

—রক্ষণশীল ! অথচ মজা এই, আমি মনে মনে ভাবতাম প্রগতি বিষয়ে আমি হলাম শেষ কথা, মূর্তিমতি আধুনিকত্ব, ভাবতাম সামাজিক স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত—

—পোড়া কপাল আমার ! স্বাধীনতা ! আষ্টে পিষ্টে শিকল বাঁধা তোমার, স্বাধীনতা কোথায় তোমার ? জোরে হাসতে পর্যন্ত পারো না তোমরা, একটু ন্যাকামি ও আধুনিকতার আমেজ মেশানো না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না তোমাদের, স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের সাহচর্যেই ত' তোমাদের অধিকতর আনন্দ !

প্রতিবাদ ক'রে বললাম—ছিঃ ছিঃ একি বলছ !

আমাকে রাগাবার জন্যই উনি আরো কঠিন ও কঠোর ভংগী ক'রে ব'লে উঠলেন—কি যে তুমি হয়ে যেতে সে কথা তোমার ভালই জানা আছে। সেই পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে তোমাকে উদ্ধার ক'রে মহিয়সী ক'রে তুলেছি—

এ কথার কি জবাব দেব, চুপ ক'রে রইলাম। কথাটা সত্যই সত্যের কাছাকাছি। এই সব কথাই অল্প-বিস্তর সত্যকথা।

এক পাল অসভ্য গেঁয়ো ছেলেমেয়ে দেখবো মনে ক'রেই ত' ওখানে গিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যতই সময় কাটতে লাগল ততই আমার ধারণাগুলি একটু একটু ক'রে মুছে যেতে লাগল, মনে আছে অন্ততঃ একবার কেমন এক অপূর্ব উদ্দীপনা আমার প্রাণে দোলা দিয়ে গেল।

আজ আর সেই অবস্থা বর্ণনা করবার আমার শক্তি নেই। একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সেই মুহূর্তেই পেয়েছিলাম।

তিন

আকাশ ও মৃত্তিকা

আমি বসেছিলাম বড ছেলে রমানাথ আর ছোট সোমনাথের মাঝখানে। আর মনে আছে ওদের ঐ কারুণ্যের আতিশয্য দেখে আমি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠেছিলাম মনে মনে। জীবনে কখনো এমন অনুগ্রহ বা করুণা দেখানোর সাহস ত' কারো হয়নি।

কিন্তু প্রয়োজন হ'লে আমি অন্ততঃ সহৃদয় ও সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারতাম, অন্ততঃ এই চৌধুরী পরিবারের প্রতি আমার অন্তর সত্যই করুণায় ভ'রে উঠেছিল, এরা কত অসহায় ভাবেই না জীবন কাটায়! এই যখন শাড়ী বা কানের দুল দেওয়া হ'ল, ওদের তখনকার মুখভাবেই আমার মনে করুণা জেগেছিল, এই পল্লীগ্রামেই ত' এদের জীবন্ত সমাধি। সাধারণ ঢঙের সাধাসিধে কাপড় পরে, সাজ-সজ্জাও সাধারণ, একালের কিছুই জানে না।—

ওদেব অতি কৃপার পাত্র ব'লে মনে হচ্ছিল।

এ ছাড়া ঐ সময় যে সব আলোচনা চলছিল তার অর্ধেক আমি বুঝতে পারছিলাম না। একেবারে অর্থহীন ও অসংলগ্ন ব'লে মনে হচ্ছিল, তার ভিতর নতুন গরু বাছুর থেকে সমসাময়িক রাজনীতি, সঙ্গীত, সাহিত্য সব কিছুই ছিল। এই জাতীয় কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল—আর কিছু নয় এরা সবাই বাতিকগ্রস্ত, একটু ছিট আছে মাথায়। তাই এমনই আবোল তাবোল ব'কে চলেছে—

সহসা রমানাথ চৌধুরী বেশ মৃদু গলায় বললেন—আমরা বড় বিরক্ত করছি, না ?

কথাটা ত' নেহাৎ মিছে নয়, বিরক্তির অপরাধ কি, তবু মনোভাব চেপে মুখে একটু ম্লান হাসি টানলাম, কথার জবাব দিলাম না।

রমানাথ বাবু সহজে ছাড়বার পাত্র নন, বললেন,—আপনার কি ভালো লাগে ? মানে কোন্ জিনিষে ঝোঁক বেশী ?

না ভেবে চিন্তে জবাব দিলাম—কিসের ওপর যে ঝোঁক কি ক'রে বলি—তবে টেনিস খেলতে ভালোবাসি আর—

আমার নিজের কানেই কথাটি বিশ্রী শোনালো। সত্যই ত' কি আমি ভালোবাসি। কিসের ওপর ঝোঁক কি ক'রে বল্‌ব! এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সত্যই ভাবতে লাগলাম।—কিছুই জবাব মনে এল না। নিজের অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—তেমন ঝোঁক কোনও জিনিষের প্রতি নেই।

এই সময় প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে বাঁচিয়ে দিল শেফালীর ছোট বোন শীলা—বললে—মা কি আশ্চয দেখ, মিনতিদি'র মুখখানি ঠিক রাঙা দিদিমার মতো, যেন ছবি—

চৌধুরী মেসোমশাই বললেন—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই মা, খুবই সম্ভব। তোমার রাঙা দিদিমা আর মিনতির দিদিমা দুই বোন ছিলেন—খুব বেশী দূরত্ব নয়, আর আশ্চর্য কত কিছু সংসারে ঘটে—

আমি লজ্জাভরে মাথা নীচু ক'রে বললাম—না, না, তা কি হয়।

এই কথা ব'লে আমি আমার শুভ্র হাতের আঙুলের বিচিত্র বর্ণের নখরঞ্জক 'পালিসে'র দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন আমার মনে হ'ল, উনি আমার মনোভাব বুঝে ফেলেছেন, তাই মৃদু মৃদু হাসছেন।

সোমনাথ ছেলেটি এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল, সে এইবার ব'লে উঠল—জয়ন্তদা'র খুব ভালো লাগবে—রাঙা দিদিমার ছবিটি ত' ওঁর ভারি পছন্দ—'

কোণের দিক থেকে একটি অপরিচিতা মেয়ে ব'লে উঠল—জয়ন্তদা ত' বলেন রাঙা দিদিমা তাঁরই সম্পত্তি।

মালতী মাসি আলোচনাটুকু আরো রহস্যঘন ক'রে বললেন—জয়ন্ত যা বলে ঠিকই বলে, হয়ত—মানুষের সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের। কে জানে কার কোথায় টান— ·-

প্রসঙ্গটা ক্রমশঃই জটিল হয়ে উঠছে দেখছি। কে যে এই জয়ন্তদা, আর কেই বা এই রাঙা দিদিমা, আর সেই অজ্ঞাত জয়ন্তদাটির রাঙা দিদিমার একখানি ছবির প্রতি কেনই বা এত টান তা বোঝা গেল না। অথচ এই ঘ্যানঘ্যানে আলোচনায় আমার বিরক্তির আর সীমা রইল না—

শেফালী বলল—হয়ত জয়ন্তদা এসে ব'লে বসবে যেহেতু মিনতি ও রাঙা দিদিমার ছবিতে পার্থক্য কম সেই হেতু ওর ওপর তাঁর অধিকার অধিক, আর আমরা এদিকে পর হয়ে যাব—'

সোমনাথ বল্‌ল—তা যা বলেছ, জয়ন্তদা'র পবদ্রব্য সম্পর্কে এতটুকু চক্ষুলজ্জা নেই, তিনি অম্লান বদনে তাঁর দাবী পেশ করতে পারেন, জয়ন্তদা কখন আসবেন তা বলেছেন শেফালী ?

পানীয় জলের গ্লাসটি মুখ থেকে নামিয়ে রেখে শেফালী মৃদু গলায় জবাব দিল,—ঠিক যখন সময় হবে তখনই আসবেন, তাঁব আবার সময় অসময আছে নাকি !

তখনো কল্পনা করা যায় নি যে, যাকে নিয়ে এত কল্পনা, সেই মানুষটি বজবজের পথে একখানি সনাতন মোটর বাইক চালিয়ে মহেশতলার ভবনের দিকে পাড়ি দিয়েছেন। কালের ধাবমান স্রোতের মুখে এই দৃশ্যটি আমার মানস-পটে স্থির-চিত্রের মতো আঁকা রয়েছে।

দীর্ঘদিনের ঘটনা-সমষ্টির জডীভূত আকৃতি আমার সামনে অনন্ত রূপ পরিগ্রহণ করেছে। কত বিভিন্ন চরিত্র রঙ্গমঞ্চে ছায়াভিনেতাদের মতো ভেসে আসছে, স্ব স্ব ভূমিকায় পাঠ ব'লে আবার অনন্তে মিশিয়ে যাচ্ছে। এই পূর্বগামীদের মতো

অজ্ঞান ও চেতনাহীন হয়ে আমরা, যারা এই যুগের, তারাও ভেসে চলেছি। আর পরম ঔদ্ধত্যভরে মনে মনে ভাবছি আমাদের গৌরব, গরিমা ও সামর্থ্য অনন্যসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমাদের গতি অতি মন্থর আর সংশয় ও সন্দেহের দোলায় দুলে প্রতিপদেই ভুল ক'রে চলেছি।

জয়ন্তর সেদিনকার সেই মুখভংগী মনে পড়ে, কপালের ওপর শুকনো চুলগুলো এসে পড়েছে, দীর্ঘছন্দ দেহ, স্বাস্থ্যবান গৌরবর্ণ পুরুষ, কপালের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ, হাসলে সামনের ঈষৎ উচ্চ দাঁতগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—কিছু কাল চেয়ে দেখবার মতো অপরূপ আকৃতি।

আমি তখন মালতী মাসিমার স্বহস্তে প্রস্তুত মাংসের বাটিটি টেনে নিয়েছি, রমানাথ আমাকে কি যেন বলতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাইরে মোটর বাইকের উৎকট আওয়াজ শোনা গেল ও প্রায় সংগে সংগেই নীচের দরজায় ধাক্কা পড়লো—

এ ঘরের সকলেই সসম্ভ্রমে ব'লে উঠল—জয়ন্তদা—! আমি মনে মনে ভাবলাম এ সেই ধরণের একটি অপূর্ব জীব যারা মেয়ে মহলে ন্যাকা সেজে, ক্লাউনের পার্ট ক'রে, সকলের সহানুভূতি ও সমর্থন কুড়িয়ে বেড়ায়—!

শেফালী বললে—জয়ন্তদা' ত' বটেই, এখন ঠাকুর ওঁর খাবারগুলি গুছিয়ে দিতে পারলে হয়।

রমানাথ বলে উঠল—ঠাকুর জয়ন্তদাকে চেনে, জয়ন্তদাকে জব্দ করতে পারে আমাদের এই কৃপানিধি—

এই সময়ে চৌধুরী মেসোমশাই বললেন—একটু খারাপ লাগছে না মা মিনতি—?

মেসোমশাই হয়ত জানতেন না যে, আমরা যে সব পার্টিতে সাধারণতঃ যাওয়া আসা করি মাঝে মাঝে তা কত নোঙরা, কত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে।

পার্টির কথায় মনে পড়ল গোলাপ হালদারের কথা, এই বিচিত্র পরিবেশে

এসে ওকে যেন একেবারে ভুলেই গিছলাম। ভাবতে লাগলাম এখন যদি সহসা বলি, এবার উঠি কিন্তু, আমার একটা এনগেজমেণ্ট রয়েছে। তাহ'লে কি মাসিমা কিছু মনে করবেন! পরক্ষণেই ভাবলাম, কি আবার মনে করবেন! বলবেন হয়ত, তাই নাকি, আহা একটু থাকলে হ'ত না, কতদিন পরে আবার দেখা হবে কে জানে—মাঝে মাঝে এস—

—বেচারা গোলাপ হালদার—

এইবার দরজা ঠেলে সশব্দে একটি মানুষ এসে দাঁড়ালেন—আর তাঁর সংগে সেই বিচিত্র বামনটি—

দীর্ঘদেহ নবাগত ভদ্রলোক একদৃষ্টিতেই সমাগত জনমণ্ডলীকে দেখে নিয়ে তখনই যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে চান, চোখে মুখে একটা অপ্রতিভ দৃষ্টি।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম,—এ আর কি, সাধারণ যুবক মাত্র, এই নিয়ে এত হৈ চৈ! নিয়মিত ব্যায়াম-করা চেহারা বটে, পেশীগুলি বেশ সুস্পষ্ট, ফুটবল খেলোয়াডও হতে পারেন, তবে খুব ভালোমানুষ টাইপের লোকও নন। হয়ত মার আদরেব দুলাল—

মালতী মাসিমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বাপ, তুমি এত দেবীও করতে পারো জয়ন্ত, আমরা ত' আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, ওপাশে আসন পাতা আছে, বসে পড, পরে গল্প কোরো—

জয়ন্তবাবু মাসিমার কাছে এগিয়ে এসে মাথাটি ঈষৎ নীচু ক'রে দাঁড়ালেন—নীচু গলায় কি যেন বললেন তাঁকে, এত আস্তে যে আমি কিছুই শুনতে পেলাম না।

মাসিমা বললেন—জয়ন্ত, তুমি ত' সবাইকেই জানো, তবে মিনতিকে জানো না নিশ্চয়ই।

মাসীমার কথা শুনে ভদ্রলোক মাথা উঠিয়ে এইবার আমার দিকে তাকালেন—

বাহ্যতঃ—অতি সাধারণ মুহূর্ত। বন্ধুজনে পরিপূর্ণ এই প্রশস্ত ঘর। চারিদিকে আহার্য দ্রব্যের প্রাচুর্য। সকালে গোলাপের সাহচর্যে মনে যেমন একটি অভূতপূর্ব

রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম, কি জানি কেন এখনও সেই অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে তুললো—আমি শ্রীমতী মিনতি মহেশতলায় চৌধুরী বাড়ীতে বসে আছি বটে কিন্তু যেন কেউ নয়। পারিপার্শ্বিক সব কিছুই যেন লুপ্ত হয়ে গেছে—স্তব্ধ, শান্ত পরিবেশ আর সেই নির্জন প্রান্তরে আমি আর এই নামগোত্রহীন অপরিচিত যুবক। পূর্বে কখনও চোখে দেখিনি অথচ উনি আমার চির-চেনা, আমার অন্তরের সামগ্রী।

বোধ হয় সামান্য কয়েক সেকেণ্ড মাত্র উনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন অথচ আমার কাছে সে যেন এক যুগ। কি জানি কেন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। শঙ্কা ও সংশয়ে সারা দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল। ওঁর চোখ দুটি আমার চোখে এসে পড়েছে—স্থির, অচঞ্চল, অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শুনলাম মাসিমা ব'লে চলেছেন—মিনতি,—আমার মাসতুতো বোনের মেয়ে, অনেকদিনের পর ওদের আমরা খুঁজে আবিষ্কার করেছি। বোধ হয় এঁদের কথা তোমাকে আগেও বলেছি। আমি অত্যন্ত কুণ্ঠাসহকারে মাথা ঈষৎ নত ক'রে তাঁকে সম্ভাষণ জানালাম, উনিও বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে মাথা নীচ ক'রে আমাকে প্রতিনমস্কার জানালেন। ঠিক সেই সময়েই ঘরে এল সেই বামন অবতার আব সংগে ঠাকুর কৃপানিধি, বললে, ওঁর খাবার নিয়ে এসেছি—

মাসিমার অনুরোধে আর বাক্য ব্যয় না ক'রে উনি বসে পড়লেন।

আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো বটে, আমি যেন শুধু দর্শকমাত্র, দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করছি। আমার অবশ্য এই অবস্থা ভালো লাগছিল না, আর ঈশ্বর জানেন সেই মুহূর্তে এই ভদ্রলোকটির সম্পর্কে আমার মনে এতটুকুও কৌতূহল জাগেনি। ভদ্রলোক পরমানন্দে খাওয়া সুরু করেছেন আর সেই সংগে গল্প করছেন যেন দীর্ঘকাল আহারও করেন নি এবং এতদিন আর কারো সংগে বাক্যালাপেরও সুযোগ ছিল না।

বিরাট ইন্দ্রজালে পরিপূর্ণ এক বিচিত্র জগতের ভিতর ভেসে চলেছি, এর

অণুমাত্র অংশও বোঝার শক্তি কারো নেই, তবু বিনা দ্বিধায় ইন্দ্রজালের স্পর্শ গ্রহণে আমাদের বাহু প্রসারিত করি, আর দম্ভভরে নিজস্ব ধ্যান ও ধারণানুসারে তার একটা নামকরণ ক'রে নেই। হঠাৎ যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন দেখি ইন্দ্রজালের বর্ণচ্ছটার অবসান ঘটেছে আর নিতান্ত অসহায় ও অপদার্থের মতো সহসা নিজেকে একান্তভাবে নিঃসঙ্গ মনে ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

রাত সাড়ে দশটার পর সহসা আবিষ্কার করলাম যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই এই সন্ধ্যাটি আমি উপভোগ করছি। যেমন অস্বস্তিকর মুহূর্ত তেমনই বিচিত্র আমার আবিষ্কার। সহসা থামতে হ'ল। নিজেকে কেমন যেন অন্ধ ও আচ্ছন্ন মনে হ'ল!

মজার কথা এই, কেন যে এমন হয়, কি যে তার হেতু, তা ভেবে পাওয়া যায় না, হিসাবে মেলে না। আমরা বিশেষ কিছুই করছিলাম না। আজেবাজে আলোচনা, বাজে কথা, তার ভিতর উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। আহারান্তে সবাই একত্র ব'সে আবৃত্তি ও গান শুনছিলাম।

তখন অবশ্য জানতাম না যিনি আবৃত্তি করছেন তিনি একজন খ্যাতনামা নট, বা যে মেয়েটি সেতার বাজিয়ে শোনালেন সেই রেণু রাহা বেতারের নিয়মিত শিল্পী। মাখন চক্রবর্তী ব্যাঙ্কের কর্মচারী হ'লেও স্বনামধন্য গীতি-রচনাকার। আর জানবোই বা কি ক'রে, কেউ ত' আমাকে বলে দেয়নি।

আমি অথচ ভাবছিলাম এঁরা'ত বেশ করছেন সবাই, এই পাড়াগাঁর পক্ষে বেশ ভালোই। ইতিমধ্যে সোমনাথ কখন উঠে গিয়ে ওপর থেকে সেই বহু-আলোচিত রাঙা দিদিমা'টির ছবি নিয়ে নীচে নেমে এলেন, তখনই সহসা কেমন একটা স্বস্তির ভাব মনে এল। মনে মনে বেশ আনন্দ বোধ করতে লাগলাম।

কেউ যদি কোনো কিছুর সংগে আপনার সাদৃশ্য আছে বলে, তাহ'লে স্বভাবতঃই অন্তরে একটা কৌতূহল জাগে—আমিও সেই রকম কৌতুহলাকুল চিত্তে পরম আগ্রহভরে ছবিটি দেখলাম। সেই রৌপ্যমণ্ডিত ফ্রেমের ভিতর থেকে দেখি

অবিকল আমারই প্রতিমূর্তি যেন প্রসন্ন চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সোমনাথ বললেন—দেখুন, চোখ দুটি একেবারে সমান, কপালের পাশের কোঁচ, ভ্রুর বাঁক কি অদ্ভুত ভাবে সব মিলে যাচ্ছে দেখুন—!'

সবাই কাড়াকাড়ি স্থুরু ক'রে দিল—দেখি সোমনাথ, এদিকে, আমাকে দাও ভাই—ইত্যাদি।

যে লোকটিকে ওঁরা জয়ন্ত ব'লে সম্বোধন করছিলেন তিনি এগিয়ে এসে ছবিখানি হাতে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ছবিটির দিকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রে আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। চোখ আর নামে না—আমার ত' মনে অস্বস্তির সীমা নেই—অথচ তিনি সেইভাবে মুখ গম্ভীর ক'রে দাঁড়িয়ে—সে মুখে হাসি নেই, মন্তব্য নেই—বাণীহীন নীরবতায় আবিষ্টের মত দাঁড়িয়ে।

পিছন থেকে এসে রমানাথও ছবিখানি দেখতে লাগলেন, বললেন,—একই ছবি ব'লে মনে হয়, না?

জয়ন্ত তেমনই গম্ভীরভাবে ছবিখানি তাঁরই হাতে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—, সাদৃশ্য আছে ব'টে তবে একজনেরই ছবি মনে ক'রে কেউ ভুল করতে পারে না। অনেক মিল আছে নাকে, মুখে, চোখে—তবে—তারপর সহসা থেমে গিয়ে বললেন—তবে আর কিছু নয়।

মাসিমা এতক্ষণে বললেন—আহা, মিনতি বেচারাকে নিয়ে তোমরা কি আরম্ভ করেছ—সবাই মিলে ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে—আহা! ও কি ছবি না স্ট্যাচু? ওর নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে—

সোমনাথ আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন—ছিঃ ছিঃ, বড় অন্যায় হয়ে গেছে—কিন্তু আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে, পূর্বপুরুষের গরিমা জ্ঞাপনে আমরা জাপানীদের সমতুল্য। রাঙা দিদিমা আর আপনার আকৃতিতে যখন তফাৎ নেই তখন প্রকৃতিতেও প্রভেদ নিশ্চয়ই কম।

—অত বড় জমীদারের মেয়ে হয়েও কি ক'রে যে শশধর শিরোমণির মতো একজন পণ্ডিতকে বিয়ে ক'রে বসলেন তা ভেবে পাইনা—

মাসীমা একটু বিব্রত হয়েই ব'লে উঠলেন—তুই থাম দিকি—বড় বাজে বকিস্—

আমার ঠিক ভালোই লাগছিল। যাঁর আকৃতির সংগে আমার এতখানি সাদৃশ্য তাঁর সম্বন্ধে শুনতে ভালোই লাগছিল—আমি তাই ভদ্রতার ভংগীতে বললাম—না, না, তাতে কি হয়েছে। এসব ত' জানাই উচিত। সোমনাথ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—তারপর ?

—তারপর আর কি, কর্তা দাদামশাই জয়নারায়ণ মজুমদার—রাঙা দিদিমার বাবা, চারিদিকে লেঠেল পাঠালেন—শিরোমণি ঠাকুরকে ধ'রে আনবার জন্য—তারা যখন সর্বত্র ঘুরে হয়রাণ হয়ে ফিরে এল, তখন দেখে শিরোমণি ঠাকুর আর রাঙা দিদিমা কর্তাদাদুর সামনে বসে আর কর্তাদাদু শান্তভাবে গীতা পাঠ করছেন।

কর্তাদাদু ওঁদের যে বাড়ি ক'রে দিয়েছিলেন জয়রামপুরের সে বাড়িটি আজো রাজা ঠাকুরের বাড়ি ব'লেই পরিচিত—কিন্তু কেনই বা রাজা আর কেন যে ঠাকুর তা কেউ জানেনা—

গীতি-রচনাকার মাখন চক্রবর্তী বললেন—এতদ্দ্বারা কি বলতে চান আপনাদের রাঙা দিদিমার সংগে ওঁর চেহারার মিল আছে তাই উনিও এই কালের এক শিরোমণিকে মাথার মণি করবেন। তারপর, আমার সাজ-সজ্জা ও রঞ্জিত নখ দেখে বললেন—তবে সে বিষয়ে খুব বেশী শংকার কারণ নেই, উনি শহরের মেয়ে—

সোমনাথ বললেন—শহরের মেয়ে সে বিষয়ে ত' কোনো সন্দেহ নেই, তবে আমি বলছিলাম যে, আকৃতির যেখানে এতখানি সাদৃশ্য সেখানে প্রকৃতির মিল নিশ্চয়ই বর্তমান! আমাদের বাহ্য প্রকৃতি অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি, বাইরের রক্তমাংসে তাই অন্তরলোকের ছাপ এসে পড়ে, সে রোধ করার শক্তি কারো নেই।

এই সব কথা আর আমার কানে তেমন ভালো লাগছিল না, ভাবছিলাম জয়ন্তবাবু কি বলতে চাইছিলেন, কি এমন কথা যে বলতে বলতে থেমে গেলেন।

আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম, তিনি কিন্তু সব কিছু বিস্মৃত হয়ে কৌচের ভিতর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে আত্মসমাহিত ভংগীতে বসে কি যেন চিন্তা করছেন।

মনে মনে একটু বিরক্ত হ'লাম।

মাখন চক্রবর্তী হারমোনিয়ামের সংগে একটা প্রাচীন গম্ভীরা গান ধরেছিলেন, গানটি নাকি উনি অতিকষ্টে সংগ্রহ করেছিলেন। সুরটি সত্যই ভালো—বিশেষতঃ শেষের লাইনটির টানটুকু চমৎকার লাগছিল, "ওরে আমার শুকপাখি, দুটো গোপন কথা বলি শোন"—এই সময়েই আমার মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হ'ল, বেশ শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব নয়, কেমন একটা নবাবিষ্কারের উত্তেজনা—অন্ধকারে অবলুপ্ত অতি-পরিচিত কিছুর যেন স্পর্শ পেয়েছি, যা' আমার অন্তরের, অনেক দিনের, অথচ বিস্মৃত, যা একান্ত আমার—

এই ঘরখানি—এই ঘরের ময়লাধরা প্রাচীন অয়েল পেন্টিংগুলি, পুরাতন কাঁচের ঝাড, বিরাট হরিণের শিং, চীনে মাটির ফুলদানি সবই আমার পরিচিত। এমন কি এই পরিবারের সকলেই যেন আমার আপন জন, চির-পুরাতন। মনে হ'ল আমাদের বাড়ী, তার ঔজ্জ্বল্য, পার্টি আর পারিপাট্য, গোলাপ হালদার এমনকি, আমার বাবা ও মা সবই যেন আমার কাছে সেই মুহূর্তে অবলুপ্ত হয়ে মন থেকে মুছে গেছে—

যেন আমার মনের ভিতর একটি সমস্যা এতক্ষণ খচ্‌খচ্‌ করছিল। এইবার সেই সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেল, নিমন্ত্রিতেরা বাড়ি ফেরার কথা বলাবলি করতে লাগলো। চার পাঁচজন উঠে পড়লেন, আমিও সেই সংগে উঠে দাঁড়ালুম, জয়ন্ত বাবুও উঠলেন দেখলুম।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, আকাশে চাঁদ নেই, অগণিত তারকার চাঁদোয়া মাথার ওপর। আমরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে কথা কইছিলাম, হরিসিং গাড়িটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল।

গাড়ি এসে দরজার সামনে থামল, হরিসিং সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দাঁড়াল।

আমি সবাইকে নমস্কার জানিয়ে গাড়িতে এসে উঠলাম, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আর সেই পুরাতন জগতে, বাবা, মা ও গোলাপ হালদারের জগতে যেন ফিরতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। মনে মনে বাসনা হচ্ছিল এদের কাউকে সংগে নিয়ে যাই। আজকের, এই দিনটির স্মৃতি আমার অক্ষয় হয়ে থাক্।

মাসীমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই বললেন,—আবার এসো তাড়াতাড়ি, আমাদের ভুলে যেও না। সামনের মাসেই এসোনা একদিন, শিরোমণি ঠাকুরের বাড়ি যাওয়া যাবে—

মেসোমশাইএর গলার স্বর সবাইকে ছাড়িয়ে উঠল—তিনি বললেন—এত হৈ চৈ করছ কেন, ও আসবেই, ও আব আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না।

তাঁর গলার স্বরে বিদ্রূপ ছিল কিনা বুঝতে পারলাম না। হরি সিং আমার পায়ের ওপর পাতলা রাগ বিছিয়ে দিল। আমার সামনে মোটরের কাঁচের আলোর ওপর হরি সিংএব ছায়াচিত্র দেখা গেল—ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়ল—গাড়ি থেকে মুখ বাডিয়ে দেখলাম সবাই সেই ভাবেই দাঁডিয়ে—গাডি একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল পিছন থেকে একজন দৌডে আসছে আর চেঁচাচ্ছে। হরিসিংকে গাডি থামাতে বললাম—গাড়ি থামতেই দেখি জয়ন্তবাবু দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছেন—মাথার লম্বালম্বা চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে। দেখুন, আমাকে একটু লিফট্ দিতে পারেন, আমাব বাইকটা খারাপ হয়ে গেছে, অথচ কোলকাতায় ফিরতেই হবে, এত রাতে বাস বা ট্রামও নেই।

আমি শুষ্ককণ্ঠে বললাম—বেশ ত'। কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন বলুন দেখি,—মানে—

হরি সিং নেমে দাডিয়েছিল—সে বল্ল—হুজুর, আমাকে একটু দেখিয়ে দিন ছোটখাটো মেরামত আমি করতে পারি।—আমারও কিঞ্চিৎ শঙ্কা হল ও' হয়ত সেরে দিতেও পারে—শোনা গেল জয়ন্ত বলছেন—

—মেরামত করতে সময় লাগবে, আমি এত রাত্রে আর এই ঠাণ্ডায় ওঁকে আটকে রাখতে চাই না।

আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাবেন আপনি ?—

—পণ্ডিতিয়া রোড, ওখানেই থাকি আমি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম—আমি যাব উত্তরে, আপনি দক্ষিণে—বেশ ত' উঠে আসুন—

উনি মাসিমাদের উদ্দেশ্যে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—চললাম—

তারপর গাড়ি চলতে লাগল আর উনি আমার পাশের সিটে চেপে বসলেন। গাড়ি সেই নৈশ পল্লীর অখণ্ড নীরবতা ভেদ ক'রে ছুটে চলল—পল্লীপথের ছায়া-ঘেরা পথ, আকাশে অসংখ্য তারার মালা—আর হিমেল হাওয়া। এতটুকু জায়গায় এই ভাবে উভয়ে একা থাকা, তায় আবার এত অল্প-পরিচিত, কেমন বিশ্রী লাগল। বুকের ওপর যেন একটা ভারী বোঝা চাপানো হয়েছে, কথা কওয়া কঠিন।

জয়ন্ত কিন্তু আমাকে জানতেন, খুব বেশী না জানলেও অন্ততঃ কিছু জানতেন। আর যাই হোক একই বাড়িতে ত' এতক্ষণ কাটলো—উভয়ের নাম জানা আছে, এতক্ষণ চৌধুরী বাড়িতে ত' অনেক কথাই হ'ল।

সুতরাং আমরা ঠিক একা নই, চৌধুরীরাও ত' আছেন। যা কিছু আমরা পরস্পরের সম্পর্কে জেনেছি সে ত' ঐ চৌধুরীদের সহযোগিতায়। উনি চৌধুরীদের বন্ধু আর আমি ওদের আত্মীয়া। এইটুকুই আমাদের পরিচয়।

গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার—এত অন্ধকার যে ওঁর মুখটাও ভালোভাবে দেখা যায় না—আমি কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে অত্যন্ত সচেতন ছিলাম—নিঃশব্দে কেন চুপ ক'রে বসে আছেন তাই ভাবতে লাগলাম।—কি যে উনি ভাবছেন তাই মনে ক'রে বিস্ময় বোধ করছিলাম। কিছু একটা কথা সুরু করার জন্য উস্‌খুস্ করতে লাগলাম—কিন্তু বলার বলার মত কিছু খুঁজে পেলাম না।

আমি এখনও তাই মাঝে মাঝে ভাবি বাঁ দিকের হেড ল্যাম্পটা যদি হঠাৎ বন্ধ না হ'য়ে যেত তাহ'লে হয়ত সারা পথটা আমরা এইভাবে অস্বস্তিকর নীরবতায় কাটিয়ে দিতাম।

কিন্তু হেড ল্যাম্প খারাপ হ'ল,—হরিসিং দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—এক মিনিটও দেরী হবে না দিদিমণি, বাল্‌বটা খারাপ হয়ে গেছে, বদলে দিলেই হবে। কাছেই পেট্রল স্টেশন। চট্‌ করে নিয়ে আসছি।

হরি সিং অন্ধকারে হারিয়ে গেল; বললাম,—আজ দেখছি সব দিকেই গোলমাল। প্রথমে আপনার গাড়ি খোঁড়া হ'ল, এবার আমার পালা—

বুঝলাম উনি হাসলেন, বললেন,—এক নিঃশ্বাসে আর আমার গাড়ির নামোচ্চারণ করবেন না। আপনার গাড়িকে অপমান করা হবে। কালোয়ারের দোকানে ও রকম গাড়ি হয়ত দুচারখানা আরো পড়ে থাকতে পারে। চলুন বরং গাড়ি থেকে নেমে বাইরে একটু দেখা যাক্‌, ও ত' এখনই ফিরবে। রাত্তিরটা বেশ লাগছে—

প্রস্তাবটা খুব লোভনীয় মনে হ'ল না—তবু বললাম—বেশ ত' চলুন—

উনি আমাকে হাত ধরে নামালেন।

পথে একটু সরে দাঁড়াতেই ইউনিয়ন বোর্ডের কেরোসিনের আলোয় ওঁর মুখটি ভালো করে দেখা গেল। মুখটিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। মাথার সামনের দিকে চুল কিছু কম, টাক পড়ে আসছে, পিছনে হয়ত সেই কারণেই চুলের প্রাচুর্য—হাওয়ায় পিছনের চুল মাঝে মাঝে কপালে এসে পড়ে।

মনে হ'ল এই মুখ আমার অপরিচিত নয়, কোথায় যেন দেখেছি—

সামনেই রেলের লেভেল ক্রসিং, লোহার গেটটি বন্ধ, দূরে সিগন্যালের রঙীন আলো দেখা যাচ্ছে। একটি মালগাড়ি আসছে, ইঞ্জিনের তীব্র সার্চলাইটে অনেকখানি অঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। আমরা এইখানে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিক স্তব্ধ, গাছের পাতাটিও যেন নড়ছে না,—ঘাসে নিস্পৃহ সহনশীলতা,

পাখিরাও ঘুমাচ্ছে। শুধু সুদূর নক্ষত্র-লোক থেকে তারারা নীচের এই রহস্যময় জগতের দিকে তাকিয়ে আছে। তবু এই নীরবতার ভিতরও প্রাণের স্পন্দন আছে—ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়, সেই প্রাণ-চাঞ্চল্য। এই কুয়াশাচ্ছন্ন মাটিতে যেন প্রাণের অনন্ত রসমাধুরী আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ছে—

মানুষ আর পাখিরা যখন ঘুমিয়ে আছে, জগৎ যখন স্তব্ধ, তখন জীবন তার পরিপূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত। নিঃশব্দে স্পন্দমান জীবনের পরিপূর্ণতার অভিষেক চলেছে—

আগে জানতাম না। কোনো দিন এ ভাবে জগৎকে দেখিনি। এ চোখে অন্ততঃ দেখিনি। জীবনে আমি এই প্রথম আকাশের পটভূমিতে গাছের ছায়া দেখলাম, ঘাসের সুমধুর গন্ধ, লেভেল ক্রসিং-এর সজীব উপস্থিতি সব কিছু বিশেষ ক'রে অনুভব করলাম। অন্তরে পেলাম একটা অপূর্ব প্রেরণা। আমিও যেন বেড়ে চলেছি, ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

সেই তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জয়ন্ত। তারপর উচ্ছ্বাসভরে ব'লে ওঠেন—বিধাতার সৃষ্টি কি বিচিত্র! সহজ চোখে বোঝা যায় না—! আমি একটু কুন্ঠিত হয়ে উঠলাম। এই ধরণের কুণ্ঠা আমার আগেও এসেছে, নিজেকে তখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেছি।

জয়ন্ত বললেন—আচ্ছা, ভেবে দেখুন ত' আমরা একটা ছোট্ট কীটাণু-কীটের মতো আর মাথার উপর কোটি কোটি জগৎ-সংসার এই ভাবে ভাসমান দেখছি। স্কুলে আমিও পড়েছিলাম এমনই সব কথা, তবে এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি, অর্থাৎ অত তলিয়ে বুঝিনি। কেনই বা বুঝতে যাব, তখন কি আর অত শত নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল। ওঁর কথায় সহসা আমারও মন সচেতন হয়ে উঠল, মনে হ'ল ঐ ছোট ছোট তারাগুলো কালো কাপড়ের উপর যেন চুম্‌কির কাজ করা। সত্যই ত' কি বিচিত্র জগৎ! কি বিরাট ব্যাপার! ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে। আমি বললাম—কি জানি কেন আমার ভয় করে—

ভয় করাই স্বাভাবিক। ভয় যদি না হয় তাহ'লে বুঝতে হবে আপনি মৃত, প্রাণ-চঞ্চলতা নাই। পৃথিবীর দুয়ের তৃতীয়াংশ লোক এই ভাবেই চোখ বুজিয়ে বছরের পর বছর থাকে। আমাদের অনেকেরই না আছে চোখ, না আছে কান। কিন্তু তা ব'লে আমি সত্যই ভয় পেয়েছি নাকি ?

উনি আমার দিকে ফিরে হাসলেন। ভারি মিষ্টি হাসি। সেই রাতের অন্ধকারে বেশ বুঝলাম এ হাসিতে হঠাৎ তাঁর রূপ কি ভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। জয়ন্তবাবু হেসে বললেন—তার চেয়ে বরং ভাবুন কত সৌভাগ্যবতী আপনি—সব কিছু এই ভাবে দেখতে পারছেন, স্বচক্ষেই দেখেছেন—তারপর সেই ঘুমন্ত গ্রামের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন—আর এই সব !

এই সর্বপ্রথম আমার মনে হ'ল আমি ধন্য। এ সব দেখতে পাচ্ছি একি কম আনন্দের, কম সৌভাগ্যের কথা। সর্বদাই সব কিছু দেখেছি, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বুঝিনি যে আমি কিছুই দেখিনি, কিছুই বুঝতে পারিনি। সহসা আমাব মনে হ'ল কিছুই ত' দেখিনি এতদিন—আগে ত' নক্ষত্র দেখিনি এ ভাবে—আকাশও দেখিনি, অন্ধকারও দেখিনি ! চোখ তুলে আকাশ দেখেছি, রাতের অন্ধকারে গ্রামাঞ্চলে ছায়াঘেবা মূর্তিও দেখেছি, কিন্তু এই ভাবে কোনোদিন কি একটা প্রাচীন লোহার গেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ আর নক্ষত্র, মাঠ আর মাটি, প্রাণ-রসে উচ্ছল গাছ আর লতাপাতা দেখেছি ? আর আমি, মিনতি চৌধুবী কোনো দিন কোনোও অপরিচ্ছন্ন জিনিষে যে হাত দেয়নি, তারও বাসনা হ'ল এই ধূলা ও কাদায় অঞ্জলি ভরে নিই, মাটিব সঙ্গে অন্তরের একটা যোগসূত্র স্থাপনা করি।—

এমন সময় উনি বললেন : চলুন, এবার যাওয়া যাক, আপনার লোক আলোটি ঠিক ক'রে ফেলেছে—

আমি কিন্তু হরি সিং ও গাড়ির কথা একেবারেই ভুলে গিছলাম। ভুলে গিছলাম, বাড়ি ফিবতে হবে। বাড়ি ফেরার পথেই আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। এমনই আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম যে, মনে হচ্ছিল এই লোহার গেট, নৈশ স্তব্ধতা,

আর তার পাশে এই জয়ন্তবাবু, এই যেন নিত্যকালের। এর পিছনেও কিছু নেই, সামনেও নেই। আত্মস্থ হয়ে বললাম—সেই ভালো, রাত বোধকরি অনেক হ'ল।

—যেতে চান না নাকি ?

আমি মাথা নাড়লাম।

জয়ন্তবাবু আবার হাসলেন, বললেন—আপনাকে দেখছি রাঙা দিদিমায় পেয়েছে। দিনের আলোয় এখানে দাঁড়াতেই হয়ত আপনার ঘৃণা হবে।

—হয় ত!

—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই আপনার খাবাপ লাগবে। আমার হাতটি গেটের ঠিক ওপরকার রেলিংএর ওপর রাখা ছিল, উনি ধীরে ধীরে সেটি তুলে নিলেন। যেন সে হাত এতক্ষণ আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তারপর আমার আঙুলের দিকে লক্ষ্য ক'রে আবার গেটের ওপরই রেখে দিলেন। এর অন্তর্নিহিত অর্থটুকু আমাকে শিশুর মতো ক্রুদ্ধ করে তুল্‌ল—

—মাঠে থাকলে হাতও কি এই রকম নোঙরা হ'তে হবে নাকি ?

—না—

—তবে ?

এর উত্তর অবশ্য আমি শুনতে চাইনি। আমার হাত সম্বন্ধে উনি কি ভাবেন তাতে আমার কি আসে যায় ? একথা ভেবে আমার লাভ কি ?

—আচ্ছা, সারা দিন কি করেন ?

আজ সারা সন্ধ্যায় দু'বার এই এক প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল আমাকে। কি আমার ভালো লাগে, কি করি। এইবার কিন্তু উত্তর আমার জানা ছিল। স্পষ্টই বললাম—কিছুই করি না। উনি কি মনে করবেন তার জন্যে আমার এতটুকু সংকোচ নেই, বেশ উষ্ণ ভাবেই বললাম—বলবেন না যেন, কি ভয়ানক ! কেন না অবস্থাটা মোটেই ভয়ের নয়। বেশ আনন্দেরই ব্যাপার, আর "কিছু একটা করা"র চাইতে কিছু না করাটাই আমি ভালো মনে করি—।

উনি বললেন—এই ভাবে কতদিন আর ছেলেমানুষী করবেন ?

বাগে সর্বশরীর জ্বলে উঠল আমাব, একটা চড মাববার প্রবল বাসনা হ'ল, কিন্তু সেই নাটকীয় পবিস্থিতি না ঘটিয়ে বললাম—কি বলতে চান আপনি ?

আমার মুখেব দিকে উনি তাকালেন, বুঝলাম হাসছেন। আবার বললাম—এ কথা বললেন যে ?

উনি বেশ সহজ ভাবেই বললেন—ব্যাপারটি সহজ এবং সবল। আপনাব মুখের ওপব নাকেব মতই সাধাবণ ব্যাপার মাত্র, অর্থাৎ এখন এই মুহূর্তে আব আপনি "বিলাসিনী ধনী তনযা" নন। ভুল ক'বে আপনি একটা খেলো সামাজিক নাট্যে অভিনয় ক'বে চলেছেন। নাটকটি জোলো এবং তৃতীয় শ্রেণীর। ভয় নেই, শীগ্‌গীবই এব ভিতব থেকে আপনাকে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমি যেন দুই বা নব্বুই বচবেব জডবুদ্ধি প্রাণীবিশেষ এমনই করুণার ভংগীতে জয়ন্তবাবু কথাগুলি উচ্চাবণ ববলেন। বললাম—ঠিক আপনি যে ভাবে বলছেন, ঐ ভাবে আমি হয়ত বেবিয়ে আসতে পাববো না, তাছাড়া কোথা থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবো ? আপনাব কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

—বুঝছেন বৈকি—'

—না হেঁয়ালি ছাড়ুন,—কথা স্পষ্ট ক'বে বলাই কি বীতি নয় ?—

উনি কিছুই বললেন না। আর সেই নীববতা যেন শাণিত ছুবিকাব মত বিঁধতে লাগল।

অনেবক্ষণ পবে বললেন—বাত অনেক হ'ল।

আমি সে কথার জবাব না দিয়ে উত্তেজিত ভংগীতে বললাম—আপনি সুবিধা পেয়ে আমাকে যা তা কথা শোনালেন, আমাব সমাজ আমাব শিক্ষা নিয়ে ব্যঙ্গ কবলেন। এটা কিন্তু সুরুচিব পবিচয় নয়।

উনি কিন্তু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বল্লেন—আব ছেলেমানুষী কববেন না।

কোথায় গিয়ে পৌচেছি বুঝি না, পথ হারিয়ে অন্ধকারে যেন ঘুবে মবছি।

ওঁকে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম। ঐখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মনে মনে কি যে ভাবছিলেন উনি, হয়ত আমি সেদিন তা বুঝেছিলাম। ওঁর হাতের স্পর্শ, ওঁর প্রকৃতি, দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগ সবই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই ভাবে যেন আগেও আমরা কলহ করেছি, এমনই নীরবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কালহরণ করেছি। আমি আমার হাত দুটি বুকের উপর চেপে রাখলাম। মনে মনে একটা প্রবল বাসনা অনুভব করছিলাম—ওঁকে স্পর্শ করার জন্য। ওঁর সান্নিধ্য আরো নিবিড় ক'রে পাওয়ার জন্য অন্তরে যেন একটা ব্যাকুলতা জেগেছিল। সব কথা চেপে শুধু মৃদু গলায় বললাম—

চলুন তাহ'লে যাই। এই ভাবে কি দাঁড়িয়েই কাটাব সারা রাত ?

ভেবেছিলাম এ কথার হয়ত উত্তর পাওয়া যাবে না, তবে তাতে আমার আর কি আসে যায়। কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক ভাব চারিদিকে। এই নক্ষত্রমালা, জগৎসংসার, আকাশ আর আলো, মাঠ আর মাটি, পাড়াগাঁ আর মধ্যরাত্রি আর এই অপরিচিত বন্ধু, সবই যেন সেই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় লোকের এক একটি অংশ। ভালোই ত' এদের ছেড়ে অনেক—অনেক দূরে পালিয়ে যাব। কোথায় থাকবেন ইনি, মাসিমারা, আর কোথায় আমি ? গোলাপ আর আমি যে যাবার আয়োজন করেছিলাম তার জন্য এই সর্বপ্রথম অন্তর থেকে একটা সমর্থন পেলাম। অনেক কিছু মজা দেখা গেল। এবার কিছু ঘটুক। আর সেই প্রাচীন পরিবেশ ভালো লাগে না। এমন সময় শুনলাম জয়ন্তবাবু বলছেন—আমাকে নিয়ে কি ঘর বাঁধতে পারেন ? মানে, বিবাহিত জীবন ?

—কি ?—কি বললেন ? ফোঁস্ ক'রে উঠলাম আমি আহত অভিমানে।

পাগলামির চূড়ান্ত ! জানা নাই শোনা নাই, কথা নেই বার্তা নেই, একেবারে বিয়ে। লোকটা বলে কি ? কেমন যেন অসুস্থ বোধ হ'তে লাগল নিজের। মনে হ'ল, এই গেট থেকে সরে গিয়ে পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি।

উনি আবার বললেন—কই জবাব দিচ্ছেন না যে ?

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, সেই রাতের অন্ধকারে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না, তাছাড়া আমি তখন কাঁদছিলাম, সারা শরীর আমার কম্পমান, সারা দেহে হিম প্রবাহ অনুভব করতে লাগলাম।

আমার হাত দুটি তুলে ধ'রে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে উনি বললেন—আমি ঠিক জানি, একদিন তুমি ধরা দেবে—

আমি কিছুই বললাম না, কিছু বলতে পারলাম না। তখন ভাবছিলাম উনি একটু রসিকতা করছেন, রাত্রি গভীর হয়েছে, কাছাকাছি কেউ নেই, তাই হয়ত—

উনি পুনরায় বললেন—কই জবাব দিচ্ছ না যে?

আমার মাথার খুব কাছেই ওঁর মাথাটি নুয়ে পড়েছে, আমার হাতটা প্রায় ওঁর বুকের ওপরেই, হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে—

সমগ্র বিশ্বজগৎ, আকাশ ও মৃত্তিকা, গাছ আর পাতা, আমাদের বাড়ি, বাবা আর মা, গোলাপ আর আমি, মাসিমারা, রাঙা দিদিমার ফটো, যা কিছু আমি জানি, ওঁর আর আমার জীবনের সংগে বিজড়িত হয়ে সব যেন এখানেই এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। সকলের জীবন-ধারা যেন একই সূত্রে একই তালে বাঁধা হয়ে গেছে—

ধূসর মৃত্তিকার ভিতর থেকে কি নবজীবনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে?

তৃতীয়বার উনি বললেন—কি জবাব দেবে না?

আমার গলায় ওঁর স্পর্শ অনুভব করলাম। রাতের শীতল হাওয়ায় সেই স্পর্শ শীতলতরো হয়ে উঠেছে,...

ভুলে গেলাম সব, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। আত্মহারা হয়ে এক ফেলে আসা দিনের স্বপ্ন ও সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্চ্ছনায় ভরে উঠল আমার প্রাণমন। যে গান আমি যুগ যুগ ধ'রে জানি, যে সুর সৃষ্টির প্রথম দিনে ধ্বনিত হয়েছিল আমার কানে, এতদিন যা সম্পূর্ণ ভুলেছিলাম, আজ আমার সেই সোনালি অতীত আবার ফিরে এল; আত্মহারা আবেগে আমার অন্তর আকুল হয়ে উঠল।

চার

ঝড়ের মুখে খড় কুটো

এ যুগে আমাদের অনেকের কাছে পুরাতন দিনের প্রেমের অবসান ঘটেছে, মৃত্যু হয়েছে। আমরা ভালোবাসা, প্রেম ইত্যাদি জোলো কথায় আর বিশ্বাস করি না। রোমান্স, স্বপ্ন, চাঁদের আলো, ভালোবাসা, পাখির ডাক, ইত্যাদি কথা এদিনে নাকি অশ্লীলতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। নববিধানানুসারে এ সব নিরর্থক জিনিষ ভুলতে হবে। অথচ যাঁরা এই বাণী প্রচার করছেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ত' ঠিক এই মতের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে না। যা আমরা আজকাল বিশ্বাস করি, যেটা এ দিনের ফ্যাসান সেইটিই সত্য ও গ্রহণীয়। এখন আমরা যা স্বীকার করি তা দেহগত যৌন প্রয়োজন মাত্র। এখন প্রয়োজন, সুবিধা ও সুযোগের উপর সব কিছু নির্ভরশীল। আমরা আর এখন জীবনের ও প্রেরণার গ্রাহক নই, আমরা আজ এক একটি "চিন্তাশীল যন্ত্রে" পরিণত হয়েছি। কিন্তু আমরা পছন্দ করি আর না করি, বিশ্বাস করি আর না করি "প্রেম জীবনের পরিপূরক", যে কোনও পথে আমরা পরিভ্রমণ করি না কেন, এমন কি ঐ জৈব বিজ্ঞান ও যৌন প্রয়োজনের পথেও যদি পাড়ি দিই তাহ'লেও পরিণামে সেইখানে গিয়ে পড়ি, আর সেই নীতিরই সম্পূর্ণতা এনে দিই যে নীতি সুরু হয়েছিল "let there be light"—এই কথাটিতে। আবার একদিন এই গতিচক্র সম্পূর্ণ হবে। সেদিন আবার আমরা

ফিরে গিয়ে দেখব জীবনই প্রেম আর প্রেমই আলো—সক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত, জ্যোতির্ময়।

আমারও ভুল হতে পারে। হয়ত একথা আমি আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যেই লিখছি, জয়ন্ত আর আমি উভয়ে যে উভয়কে প্রথম দিনেই ভালোবেসেছিলাম সেই কথাই হয়ত আমার এই কথাগুলিতে সমর্থিত হয়েছে। আমার কাজটা যে খুবই ভালো হয়েছিল আমি তা বলছিনা, হয়ত হয়নি ; তবে এখন ত' একটা গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখতে বসিনি—শুধু যা ঘটেছে সেই কথাই লিপিবদ্ধ করছি।

মাসিমাদের বাড়িতে আমি নিজের উপর একটি লেবেল এঁটে গম্ভীর হয়ে বসেছিলাম, জয়ন্ত যখন দোর ঠেলে ঘরে এসেছিলেন তখনও আমার সে গাম্ভীর্য অটুট রেখেছিলাম। এই মুহূর্তে আমাদের এই মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপারে "ভালোবাসা", "চাঁদের আলো", প্রভৃতি কথাগুলিও তেমনি দূরে সরিয়ে রাখা হ'ল।

সেইদিন প্রথম বুঝলাম প্রেমের ক্ষয় নেই—মৃত্যু নেই।

সেই ঘটনার পরদিন প্রভাতের পূর্বে মনে হয়নি যে, জয়ন্তবাবু পণ্ডিতিয়া রোডে থাকেন এই কথাটুকু ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই আমি জানতে পারিনি।

বিছানায় চোখ মেলে শুয়ে প্রায় হাজারবার মনে হ'ল, এ আমার দুর্বল মনের নিছক ব্যাকুলতা। কোনো মানে হয় না। ঈশ্বর জানেন, খদ্দর পরলেও লোকটা হয়ত সাধারণ বিলাসী শ্রেণীর। এতক্ষণে বোধহয় বন্ধুবান্ধব মহলে আমার নামে কেচ্ছা রটিয়ে বেড়াচ্ছে।

এসব ব্যাপারের কোন মূল্য নেই, ঘটনাটি এমনই আকস্মিক যেন বিশ্বাসের বাইরে। ঘাসের শীষ বা আকাশের তারার মতোই এর কোন হেতু নেই, যুক্তি নেই। সত্যই তাই—বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে আমার পাশে দাঁড়িয়ে উনি বললেন,—দেখ, আমার কাছে সব কিছুই শূন্য মনে হয়—অধিকারহীন নিদারুণ শূন্যতা।

যে হাসি আমি আগেও লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর মুখে সেই হাসি ফুটে উঠল; তিনি বললেন—আমরা হলুম ঝড়ের মুখে খড় কুটো।

আমার হাতের আঙুলগুলি পরীক্ষা ক'রে বললেনঃ সকালে কেউ যদি আমাকে বল্‌ত এমনই অপরিচিতা একটি মেয়ের সংগে আমার এতখানি ঘনিষ্ঠতা হবে তাহ'লে তাকে আমি উন্মাদ ভাবতাম।

আমি বললাম—এখনও পিছিয়ে যাওয়া ত' শক্ত নয়। এর আর কোনো লেখাপড়া ত' নেই।

উনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। বললেন—তা' আমার কাম্য নয়, সেইটাই হয়ত বোকামি, তোমার কি তাই মনে হয়?

না—

তিনি পুনরায় বললেনঃ শোনো, আমি জানতাম না যে,—তারপর আবার থেমে বললেন—এত সব ব্যাপার আছে যে। আমরা সবে বুঝতে শিখছি, নূতন চোখে জগৎকে দেখতে হবে।—এই সব টুকিটাকি ব্যাপার সব কিছু আমি বিশ্বাস করি। হয়ত একটি মুহূর্তের মতো তুমি আর আমি, আমাদের জাগতিক পরিবেশ, আমরা কি ও কে ভুলে যাই, ভুলে যাই ব্যক্তিগত মত ও পথ, আমাদের এই বহির্বাসের নীচে যে প্রকৃত সত্তা আছে—আত্মা আছে, সেই আত্মার সংগেই হোক্ আত্মীয়তা।—বিস্মিত চোখে তাকিয়ে উভয়ে উভয়কে বলি—"কোথায় তোমাকে দেখেছি, যেন কতদিনের পরিচয়।"

আমি শুধু বললাম—তা কি হয়! আমি আপনাকে ত' কখনো দেখিনি—'

—দেখোনি?

—কি জানি, দেখেছি কি?

উনি কাঁধ নেড়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে বললেন—হবে,—হয়ত নয়।

কথাটার মধ্যে কিন্তু নিশ্চয়তার জোর নেই।

কি জানি। ঠিক বলা শক্ত হয়ত দেখেছি, হয়ত নয়। আমরা শুধু বেঁচে আছি, একটা কাল অতিক্রম করছি। এই কিন্তু সব নয়—!

—তা জানি।' বেশ সহজ্ গলাতেই বলছিলাম আমি। কিন্তু মজার কথা এই যে, আমি সত্যিই যেন সব জানতাম, সবই যেন আমার পরিচিত।

একা শুয়ে আছি, অন্ধকার কেটে একটু আলো ফুটেছে, ভোর হয়ে আসছে, এখন এই নিরালায় শুয়ে ভাবছি—যেন সব জানি। জানি এই আকাশ, বাতাস সবই আমার চেনা, চিরচেনা। কিন্তু কেন যে তারা অন্তরঙ্গ, কিসের এই পরিচয় তা যে বলতে পারি না!

প্রকাশ্য দিবালোকে গোলাপ এবং গিরিডির কথা মনে আসার সংগে এই সব কথার অনিশ্চয়তা আরো যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

নটা বাজার পর টেলিফোনটা উঠিয়ে বললাম, পি. কে. ২২···, অনেকক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, যেন মঙ্গলগ্রহের চাইতেও দূর থেকে আসছে—

বললাম—গোলাপ, আমি মিনতি—'

—কি খবর, এত সকালেই—?

এতটুকু ইতস্ততঃ না ক'রেই বললাম—হ'লনা, যাওয়া হবেনা।'

—কেন, শরীর খারাপ, যথারীতি মেয়েলী ওজর ত'।

মনে মনে ওর মুখভাব কল্পনা করলাম। গম্ভীর গলায় বললাম—যা ভাবো তাই—'

—পি টি। গেলে হয়ত ভালোই করতে!

—পিটি কি প্রেটি জানিনা, তবে, যাওয়া চলবে না।

গোলাপ বল্ল—কথাটা এমন শোনাচ্ছে যেন বেঁচে গেলে মনে হয়। তাই না? চমৎকার গল্প হয়, কল্পনা নেত্রে ওর মুখের বঙ্কিম হাসি দেখলাম। কেমন রাগ হয়ে গেল, বললাম—হ্যাঁ, বেঁচেই গেলুম—। এই বলে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভারটি নামিয়ে রাখলাম।

মা ড্রেসিং টেবিলে বসে নখে পালিস ঘষছিলেন, আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দক্ষিণ-পূর্বমুখী ঘর, পরিষ্কার প্রভাতী রোদ ঘরে এসে পড়ছে।

ঘরে ঢুকতেই মার প্রথম কথা—এই যে, দেখ্‌না আঙুলগুলোর কি অবস্থা—। ছোটবেলা থেকেই অনেকের হাত আমি দেখে আসছি, সেই সব হাত সম্পূর্ণ স্মরণ না থাকলেও হাতের আকৃতি মোটামুটি আমার মনে থাকে। এখনই মালতী মাসির হাতটা সহসা মনে পড়ে গেল। সামর্থ্য ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুগঠিত দুটি হাত। হাতের আঙুলে বড নখও নেই, আর রঙও নেই, অথচ কি জৌলুস।

এই সব হাতের ছাঁচেই কত কি গড়া হয়, শুধু জিনিষ নয় মানুষও। হয়ত এই সব হাতের স্পর্শে যা কিছু অশুভ, যা কিছু অকল্যাণকর তা' দূর হয়ে যায়। স্পর্শ মাত্রে হয়ত মৃত্যুকেও দূরে সরানো সম্ভব হয়।

মা অত্যন্ত বিরক্তিভরে বললেন, আজ রাত্রে ললিতারা আবার আসছে, দেখ ত' কি বিপদ! সবাই মিলে আমাকে জব্দ করাব ফন্দী আঁটছে।

বুঝলাম, দ্বারিকবাবু-ঘটিত ব্যাপার। সবই ভুলে গিয়েছিলাম—গতরাত্রে আমি যেন হাজার হাজার মাইল দূরে সরে গিয়েছিলাম, এখানকার সব কিছুই মন থেকে মুছে গিয়েছিল। আগে মা ও আমার মধ্যে ব্যবধান ছিল নদীর, এখন মহাসাগরের মত বিস্তীর্ণ সেই ব্যবধান—!

মাকে বললাম (কারণ বলতেই ত' হবে),—'মালতী মাসিমা তোমাকে প্রণাম জানিয়েছেন।' মাকে কথাটা জানানোর প্রয়োজন ছিল। পুরাতন বাড়ি, লণ্ঠনের মৃদু আলো, প্রাচীন পূজার দালান, রেল লাইনের লোহার গেট, মধ্যরাত্রের আকাশ আর জয়ন্ত সব কিছুই তাঁকে বলার ছিল—আর মনে মনে চেয়েছিলাম মা তাঁর দুটি বাহুর আড়ালে আমাকে জড়িয়ে ধরবেন।

মা একটা কাঠিতে তুলা দিয়ে তুলি বানাতে বানাতে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বললেন —কোন্ মাসি বল্‌লি—?

—চৌধুরী বাড়ির মালতী মাসি। কাল রাতে ওঁদের ওখানে গিয়েছিলুম যে—।

—তাই নাকি! আমি কখন কোথায় থাকি তা' জানার প্রয়োজনও মায়ের নেই। মা তারপর বললেন—আজ সন্ধ্যার পর থাক্‌বি ত' ? নইলে ভারী মুসকিলে পড়ব।

ভাবতে লাগলাম, মা কি কখনও কোনোদিন এমনই মধ্যরাত্রে বাবার সংগে একত্রে বেড়িয়েছেন, দেখেছেন নৈঃশব্দের গাম্ভীর্য। আকাশের তারা আর ম্লান চাঁদ, কুয়াশা আর ছায়া—ভাবলাম, ভাবতেও শিউরে উঠলাম, হয়ত জয়ন্ত একদিন আমারই কোনো কথার উত্তরে—'হা ভগবান!' ব'লে সজোরে দরজা বন্ধ করবে।

মিছামিছি বললাম—না মা, আমাকে একটু বেরোতে হবে।

অন্ধকারে ঘরের ভিতর বরং শুয়ে থাকব তবু গণ্ডগোলের ভিতর থাকব না।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন তাইত',—সবই কেমন গোলমেলে হয়ে উঠছে।

মার জগৎ—দ্বারিকবাবু, ললিতারা, পালিশ-করা নখ, রঙ-মাখানো ঠোঁট, ঠুন্‌কো সামাজিকতার ভিতরই উনি জড়িয়ে আছেন। গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা নেই।

ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম, মা বোধকরি টেরই পেলেন না।

দৃশ্য ও অদৃশ্য লোক সম্পর্কে ভাবতে ভালো লাগে। দুপুরের ভিতর যখন জয়ন্তর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেলনা তখন কিন্তু আমি এই দুই লোকের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলতে লাগলাম। মহাশূন্যে সর্বশরীর দোদুল্যমান। কেমন হারিয়ে গেছি, নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হ'তে লাগল, ভয়ও হ'ল। তবু সর্বদাই বিগত রজনীর সেই আকুলতা অন্তরে অনুভব করতে লাগলাম।

অবশেষে দুপুর বেলায় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল, দাসী এসে জানাল কে এক মিঃ গাঙুলী আমাকেই ডাকছেন—আমি কথা বল্‌ব কিনা—জানতে চাইল।

আমি সাগ্রহে বললাম—হ্যাঁ আমি যাচ্ছি, রিসিভারটি সুদৃঢ় হাতে চেপে ধরলাম, বললাম—হ্যালো। আজ প্রথম এই যন্ত্রটার সামনে কথা বলতে কেমন ভয় হ'তে লাগল।

দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে ভেসে এল—হ্যালো—মিনতি ?

রজনীর সেই স্তব্ধতা, সেই লোহার গেটের স্পর্শ আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

—হ্যাঁ, আমি মিনতি কথা বলছি। বেশ সহজ ভাবেই বললাম!

—ও—উনি একটু হেসে এবং থেমে বললেন—জানো, অনেক কথা তোমাকে বলব মনে মনে ভেবেছিলুম, সকাল থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম—এখন আর কোন কথাই মনে পড়ছে না, সব ভুলে গেছি।

কি কাণ্ড, কি বিশ্রী বোকামী! শুধু বললাম—তাই নাকি? একটু ভেবেই দেখনা—

মৃতের মত গলায় উনি কেবল বললেন—তাইত ভাবছি।

গতরাত্রে ছিল স্বপ্ন, ছিল আকাশ আর আকাশ-ভরা তারা—ছিল উত্তেজনা আর দুঃসাহস, আর আজ কেবল শ্লথ নিষ্প্রাণতা। দিনের বিশ্রী আলোয় রাতের অন্ধকারে রচা স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে।

উনি আবার বললেন—শোনো বলছিলাম কি, আজ বিকালের দিকে দেখা পাওয়ার আশা আছে? মানে কোন কাজকর্ম আছে নাকি?

দেখলাম একটি মাছি আমার ডেস্কের ওপর ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল, সহসা থেমে সামনের পা দুটি তুলে কি যেন একটি নোঙরা জিনিষ ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শুচি হবার চেষ্টা। কি এমন অস্পৃশ্য জিনিষের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য মাছিটা চেষ্টা করছে কে জানে।

উনি আবার বলে উঠলেন—কি হবে? হাত খালি নেই না?

—হ্যাঁ দেখা হবে, কাজ আর কি!—মনে মনে ভাবলাম কেন মরতে মিছিমিছি গোলাপের সংগে গিরিডি গেলাম না।

—তাহ'লে আজই ত'?

—বেশ ত' আজ বিকালে—

—শোনো, ভালো মুস্কিল, কোথায় একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—গোলমাল আর কি !—সাহস দিয়ে বলি।

যাক ওসব কথা, যা বলছিলাম, আজ আবার বিকালে মহেশতলায় যাচ্ছি, আমার মোটর বাইকটি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার জন্যই যাওয়া যাবে।

—যেতে এক জায়গায় হবেই, কোথায় গিয়ে সন্ধ্যাটা কাটবে, তার চাইতে ওই মহেশতলাই ভালো। প্রশ্ন করলাম—কিন্তু কি ক'রে যাবে ?

—ট্রেন আছে ঘন ঘন—ট্রেনে যাওয়া যেতে পারে, শিয়ালদার বেলেঘাটা স্টেশন থেকে ছাড়ে।

—আমি ড্রাইভ করে নিয়ে যেতে পারি।

উনি হাসলেন, ওঁর মুখভংগী যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। উনি বললেন—কালকের সেই ঢাউস্ গাড়িটা ত' ?

বললাম—ঢাউস্ ছাড়া অন্য গাড়িও আছে, সেইটাই যেতে পারে।

—ভালই হয়েছে, কিন্তু ফিরবে কিসে ? ক'টায় যাবে ?

—যখন তোমার সুবিধা হয়।

—এখনও স্নান হয়নি ? এইবার স্নানাহার সেরে নিয়ে—উনি একটু থামলেন, বুঝলাম ঘড়ি দেখছেন, একটু পরে আবার বললেন—এই দুটো কিংবা আড়াইটে, পারবে না ?

—খুব পারবো।

এরপর স্তব্ধতা। কেমন যেন বেদনানুভব করতে লাগলাম—সর্বশরীরে, হাতে, পায়ে, বাহুমূলে, এমন কি চোখেও।

—মিনতি ?

মহাশূন্য থেকে ভেসে এল তাঁর কণ্ঠস্বর।

—কি বলছ ? শান্ত কণ্ঠে বললাম।

—আসছ ত'? কোন অসুবিধা হবে না?—

এই সেই মুহূর্ত, এই আমার স্বর্ণ সুযোগ, একবার বললেই হয়, না, পারবো না। অসুবিধা আছে। তাহলেই সব শেষ হয়। আমার জীবন থেকে লোকটি সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে যায়। শুধু উনি নন, মহেশতলা, মাসিমারা, রাঙা ঠানদি, ইত্যাদি সবকিছুই ত' বিস্মৃতির অতলে মিলিয়ে যায়। আর যাই হোক্, ওরা ত' সত্যই আমার কেউ নয়, আমার জীবন-ধারার ওদের সংগে কতটুকু মিল? ওরা আমার সেই বাঁধা-ধরা জীবনের চলার পথে অপরিচিত অজানার দল। জয়ন্তও সেই অপরিচিত জনতার একজন। দিনের আলোয় ওঁর গলার স্বরও আমি চিনতে পারব না। ঠিকই বলেছিলেন উনি, সাময়িক বাতুলতায় আমরা আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম। মধ্যরাত্রের আকাশ আর একমুঠো তারা আমাদের সেই আদিম আকর্ষণে টেনে এনেছিল।

শুধু একবার স্পষ্ট ক'রে বলা 'না—পারব না'—এই কথাটুকু উচ্চারণ করতে পারলেই সব শেষ হ'ত। চিরদিনের জন্য এই নবজীবনের দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে যেত। আমার ভবিষ্যতের যে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট ছবি কল্পনা নেত্রে রচনা করেছিলাম তা' মুছে যেত।

নীল আকাশে একখানা শাদা মেঘ বায়ু চালিত হয়ে প্রবল বেগে ছুটে চলেছে। সে দিকে চোখ পড়তে ভাবতে লাগলাম, যা শুধু আমার 'সিদ্ধান্ত', আমার 'জানা' বলে ভাবছি তার ভিতর অপরের ইচ্ছাশক্তিরও চাপ আছে। শুধু আমার ও জয়ন্তর জীবন নয়,—অনাগত ভবিষ্যতের অপূর্ণ সম্ভাবনার বীজ ত' আমাদের ভিতরেই রয়েছে।

মাছিটা আবার ব্লটিংএ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, এবার দাঁড়িয়ে সেই ভাবে সামনের পা দুটি পরিষ্কার ক'রে আবার উড়ে পালাল।

—মিনতি—? ওঁর কণ্ঠে একটা উৎকণ্ঠার সুর ধ্বনিত হ'ল। ভেবেছেন হয়ত আমি চলে গেছি।

—যাব, নিশ্চয় যাব।—নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, কেন যে সেদিন মুখ ফুটে 'না' বলতে পারিনি তাই ভাবি।

উনিও যেন সম্রাটের মতো দীপ্ত কণ্ঠে বললেন,—বেশ, ঐ কথাই রইল।

খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবী আর চাদরে ওঁকে বেশ দেখাচ্ছিল। যতই মোটা হোক, খদ্দর সত্যই মানুষকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তোলে, 'ভদ্দর'ই করে। আমার ভারি ভালো লাগল, যদিচ এই সব বাঙালিপনা ও স্বদেশীয়ানা আমাদের সোসাইটিতে অচল। এতক্ষণ ওঁকে আমি গত রাত্রের সেই পোষাকেই কল্পনা করেছি, এখন তাই এই পবিবর্তন একটু নূতন লাগল, বিচিত্র ঠেকল।

মাঝে রহাট ব্রীজ ছাড়িয়ে এরোড্রোমের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি হু হু শব্দে ছুটে চল্‌ল। সহসা উনি বললেন—এইবাব ডাইনে ঘুরতে হবে। দেখি গত বজনীর সেই লেভেল ক্রশিং, সেই পুবাতন লোহার গেট। দূরে আকাশ গিয়ে মিশেছে একেবারে মাটির বুকে। গাড়ি থেকে ঝুঁকে পড়ে উনি বললেন—দেখ?

সেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম যে উনি আমাব স্বল্প-পবিচিত, মনে হ'ল আর আমার অজানা নন, চিবদিনেব অন্তর-ধন। উনি দরজাটা খুলে হাত বাডালেন আর আমি ওঁর হাত ধ'রে ধীরে ধীবে মাটিতে এসে দাঁড়ালাম।

সেই ভাবেই দুজনে নীববে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। কতক্ষণ যে ছিলাম কে জানে, একটা বেজী পাশের জঙ্গল থেকে তর্ তর্ ক'বে বেরিয়ে আমাদের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েই যেই বুঝল আমবা সচেতন প্রাণী অমনি সভয়ে ছুটে পালাল।

উনি বললেন: বেজীটা অবাক্ হয়ে গেছে, কেমন পালাল দেখলে?

রাত্রির অস্পষ্টতায় ম্লান চন্দ্রালোকের আলোছায়ায় যা ছিল স্বর্গ, যা ছিল সুষমা-মণ্ডিত স্বপ্ন, দিনের আলোয় এখন তা' প্রাণচঞ্চল। পাতা নডছে, পাখি ডাকছে।

নাম না জানা বনফুল মৃদু বাতাসে আন্দোলিত। আর নীল আকাশ জুড়ে শাদা মেঘের ভীড়।

এই মুহূর্তেই আমি মন স্থির করে ফেললাম। বুঝলাম, যা কিছু ঘটুক, যত কষ্ট, দুর্দশা, বাধা-বিঘ্ন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াক না কেন, সেই দুঃখ-লাঞ্ছনা, এমন কি বিচ্ছেদের বেদনাও, গত রজনীর সিদ্ধান্ত থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না।

জয়ন্তর সংগে পরিচয়ের প্রথম দিনটির সব কথাই আমার মনে আছে, কতদিন একথা ভেবেছি, আর এখনও এ'সব কথা ত' নিয়তই আমার মনে জাগে। চোখের উপর যেন সব সজীব হয়ে ভাসছে। এই হয়, জীবনের অভিব্যক্তির এই ত' এক একটি অংগ।

এভাবে নিসর্গ সৌন্দর্য দেখার সুযোগ আগে আর হয়নি। অন্ততঃ মনে ত' পড়ে না। একই চোখে কত জিনিষ কত বার ত' দেখিছি, তবু বিশেষ ক'রে মাঝে মাঝে দু'একটা বিশেষ চিত্র স্পষ্ট হয়ে চোখের ওপর ভাসে। কোথায় শাবক-পরিবেষ্টিত পক্ষীমাতার আকুলতা দেখেছি। ধুনী জালিয়ে বসে আছে অর্ধনগ্ন সাধু। অলস মধ্যাহ্নে পারাবত-কূজন বা মাথায় রুমাল-বাঁধা কুশলী ড্রাইভারের ইঞ্জিন চালনা, এক একটি বিচ্ছিন্ন ছবির মত কখনো বা সব কিছু ছাপিয়ে সেই দৃশ্য চোখে জাগে।

কিছুই কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। বিক্ষিপ্ত নয়। কাল, ক্রিয়া আর কর্মশক্তির পারস্পরিক যোগসূত্রে সকলেই অবিচ্ছেদ্য, এক মরণহীন বাস্তবত্বের বিভিন্ন ভগ্নাংশ।

একটি নূতন জগতের প্রবেশদ্বার আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল, বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের পুরী, এ জগতের আইন-কানুন পৃথিবীর মতোই প্রাচীন, কার্যক্রম নিয়মানুগ।

আমি, যে আমি, বারো বছর বয়সে জন্মদিনে পেয়েছিলাম হীরকখচিত হাতঘড়ি, আঠারো বছরে আসল মুক্তার হার ; জ্ঞান হবার পর যার কোনো আবদার,

কোনো অভিলাষই অপূর্ণ থাকেনি, অর্থের বিনিময়ে যা কিছু পাওয়া যায় সবই ত' আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু এই ভাবে আকাশ আর বাতাস ত' কোন দিন দেখিনি, শুনিনি ত' এমন পাখির ডাক। জরুরী প্রয়োজনে নির্গত কর্মচঞ্চল বেজী দেখিনি, এরা সবাই ব্যস্ত, আমাদের চাইতে অনেক—অনেক বেশী এদের কাজ, এদের নিজস্ব জগৎ, নিজস্ব কর্মধারা, নিজস্ব আনন্দে বেঁচে আছে।

সহসা উনি ব'লে উঠলেন—তুমি দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ, যাকে বলে শিশু। কখনো কি এসব দেখনি?

—ঠিক যে শিশু তা নয়, কিছু যে দেখিনি তাও নয়, তবে কিনা আমাদের সমাজে এ সবের কিছু মূল্য নেই। সেই সমাজে যাঁরা বিচরণ করেন, এ সব দেখলে তাঁদের বিবক্তি বৃদ্ধি হবে।

সত্যই ওবা বিরক্ত হবেন, দ্বারিক বাবু, গোলাপকে এই পরিবেশে কল্পনাই করা চলে না। গোলাপ বাবু সবচেয়ে দামী স্যুটটি প'বে সাজ-সজ্জা ক'রে এসে অনর্গল বলবেন—হাউ ডিভাইন,—পাখির ডাক তাঁব কানে পৌছবে না। আর দ্বারিক বাবু, জুতায় কাদা লাগবাব ভয়ে, গাডি থেকে নামবেনই না।

এইখানে বসেই শুনতে লাগলাম মালতী মাসিদের বাডির কথা, বড ছেলে বমানাথ একজন নামকরা কবি ও দেশ-কর্মী, জেলে অনেকদিন কাটিয়েছেন। উনি বললেন—এমন সম্পূর্ণ মানুয আর দেখিনি।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবলাম—সম্পূর্ণ মানুষটা আবার কি জিনিয!

উনি নিজস্ব ভঙ্গীতে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে একটু হেসে বললেন:—সম্পূর্ণ মানে কোনো খুঁত নেই, আর প্রকৃত জ্ঞানী, এর মানেই সম্পূর্ণ মানুষ। পৃথিবীটাই অহমিকায় বোঝাই—কেউ বা খুব বেশী চালাক, কেউ কিছু কম। রমানাথের জ্ঞানসাম্য আছে, ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আছে তার বেশীও নয় কমও নয়।

বললাম—আমার ধারণা ছিল কবিরা এলোমেলো অগোছাল প্রকৃতির—উনি অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন: বললেন—ধারণা ও ধরনে এখনও তুমি সেকালের—

তখনই সরল ভাবে বললাম—কেন, এই রকমই ত' শুনেছি। উনি আমার হাত দুটি ধরে বললেন—আমাকে দেখে কি তোমার অগোছাল ও এলোমেলো মনে হয়!

—না, না, তুমি মোটেই—, এই পর্যন্ত ব'লে ওঁর মুখে হাসি দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম—তুমিও কি কবি নাকি?

কেমন যেন বিদ্রূপের মতো শোনালো।

উনি ধীর ভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন: কেন সহ্য হয় না?

আমি এসব অবশ্য ভাবিনি, তবে মানুষের একটি কাজ ত' থাকবেই, একটা কাজ নিয়ে ত' থাকতে হবে।

উনি বললেন—অন্য কাজও করি, অর্থাৎ দেহরক্ষার জন্যই করতে হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, একটা স্বদেশী ব্যাঙ্কে চাকরী পেয়েছি। তার ফাঁকেই দুটি বই ছাপা হয়েছে, একটি কবিতা আর একটি প্রবন্ধ।

—বেশ, কিন্তু জেলটা কেন? অজ্ঞাতসারে আমার মুখ থেকে হঠাৎ এই কথা ক'টি বেরিয়ে এল।

উনি আবার হেসে বললেন—আগস্ট আন্দোলন—

—ভালো না লাগলে ব্যাঙ্কে আছ কেন?

—আছি তার কারণ 'উদর' নামক অনুদার বস্তুটি, আর আমাদের সভ্য সমাজ।

—আমার ধারণা ছিল আজকাল লেখকদের রচনা অর্থহীন হলেও তাঁদের অর্থাভাব নেই।

—যে সব বিষয়ে তোমার এ জাতীয় ধারণা আছে তা' দিয়ে একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ ভরিয়ে দেওয়া যায়।

—সত্যি লেখকদের এখনও দারিদ্র্য আছে? আগের দিনের মত অর্থকষ্ট?

সব কথা ক্রমে শুনবে, প্রবন্ধের বইটির জন্য এ পর্যন্ত পঁচিশ টাকা পেয়েছি, তাও এক সংগে পাইনি। কবিতার বই পোকাতেই কাটে, পাঠকে কিনে ঠকেনা, বিনা-মূল্যে পেলে পড়তে পারে—

—বাবা নেই ?

জানার প্রয়োজন ছিল না, যেটুকু জেনেছি তাই যথেষ্ট তবু প্রশ্ন করে বসলাম। উত্তরে উনি ঘাড় নেড়ে বললেন—না, পাঁচ বছর বয়েসে মা গিয়েছেন আর বাবা গেছেন এই বোশেখে, স্কুলমাস্টার ছিলেন, তাই মৃত্যুর দিন পর্যন্ত খেটে জীবন-সংগ্রাম ক'রে গেছেন। না খেয়ে মানুষ গড়েছেন। মধ্যবিত্তের মৃত্যুই ত' সকলের কাম্য, ধনিক ও শ্রমিক উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তারা অবজ্ঞার পাত্র।

—আমার ত' মনে হয় মধ্যবিত্ত হ'ল সমাজের মেরুদণ্ড, মধ্যবিত্তের যদি মৃত্যু হয় তাহ'লে সমাজ হবে কঙ্কালহীন জড়পিণ্ডবৎ, অনেকটা জেলি মাছের মত অপদার্থ।

উনি হেসে বললেন :—একটি দামী কথা বলে ফেলেছ। কথাটি আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, অনেকেই হয়ত ভাবেন, ফ্যাসান-বিরুদ্ধ ব'লে মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারেন না।

—তুমি তাহ'লে একান্তই একা ?

—হ্যাঁ, শুধু আমিই আছি, অর্থাৎ এখনও আছি—আর আছে আমার দেশ।

আমরা প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছের ছায়ার নীচে বসে ছিলাম, গাছটিতে অসংখ্য পাকা তেঁতুল ঝুলছে, আমার হাতখানি তখনও উনি কঠিন ভাবে ধ'রে আছেন, সেই স্পর্শের প্রভাবে আমি শিশুর মতো হয়ে গেছি।

ব্যাঙ্কে একটি লোক আমার চেক ভাঙিয়ে দিতেন, কাউণ্টারের ওপাশে বসা চশমা চোখে সেই ভদ্রলোকটির কথা কোনো দিন চিন্তা করিনি, আজ তাঁর মুখখানি স্পষ্ট হয়ে উঠলো। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হবে, শীর্ণ ফ্যাকাশে চেহারা, সামনের দাঁত দুটি কিঞ্চিৎ বড, কথা কইলে মুখে থুতু এসে জমে, তাড়াতাড়ি জিভ টেনে সামলে নেন। সামনে প্রকাণ্ড মোটা লেজার বই খোলা থাকে, সার্ট পরেন, গলার বোতাম খোলা থাকে, একটি তুলসীর মালা দেখা যায়, ভদ্রলোক ধার্মিক বা ধর্মভীরু। আজ সেই ভদ্রলোকটির পরিবর্তে জয়ন্তকে সেই অবস্থায় কল্পনা করতে পারলাম না। শুধু প্রশ্ন করলাম :

—আরো বই লেখার বাসনা আছে ?

—হ্যাঁ, একদিন ব্যাঙ্ক ছেড়ে দেব, তখন সর্বতোভাবে দেশের কাজেই মেতে থাকবো। মনের মতো একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করা আর স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশের সেবা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা।

—একটি বই পড়তে দেবে ? বুঝবো না ?

—বুঝতেও পারো, তবে কবিতাটাই আগে দেব।

উনি আমার হাতখানি নিজের বুকের ওপর চেপে ধ'রে আবেগপ্লুত কণ্ঠে বললেন :—মি ন তি—! আমার সংগে দেশের কাজেও তুমি পাশে এসে দাঁড়াবে ত' ?

মৌনসম্মতি জানিয়ে আমি পাষাণ প্রতিমার মতো নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে নিঃশব্দে বসে রইলাম।

এই ভাবেই আমাদেব নব জীবনের যে সূত্রপাত ঘটলো, হয়ত পৃথিবীর সর্বত্র সর্বকালে সকল নব-নারীর জীবনে এমনই ঘটে। ধীরে ধীরে উভয়ের উভয়কে জানবার সুযোগ মেলে, আত্মাব সংগে হয আত্মীয়তা—এবটা দৈহিক যোগাযোগের বাসনা জাগে, প্রেম চায় নিবিড দৈহিক অভিব্যক্তি। তখন প্রিয়জনের সংগে কণ্ঠহারের ব্যবধানটুকুও অসহনীয় হয়ে ওঠে, চাই আরো কাছে পেতে, আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগ।

গাড়িতে উঠে উনি পুনরায় মালতী মাসিদের কথাই বলতে লাগলেন, ওদের কত ভালোবাসেন, কবি রমানাথ থেকে বামনাবতাব বনমালী সবাই ওঁর প্রিয়। কিন্তু আমি যখন এই ভালোবাসার কারণানুসন্ধান কবতে গেলাম তখন ওঁর মুখে যথারীতি ভ্রূকুটি ফুটে উঠল।

উনি বলতে লাগলেন—কেন যে ভালবাসি তা বলা শক্ত,—এইটুকু বলে উনি একটু থামলেন। বাইরের প্রশস্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে বললেন,—ওঁরা আমার

বন্ধু—কিন্তু সেইটায় সব নয়। এর ওপরেও অনেক কিছু আছে। আমার বিশ্বাস ওরা অন্ততঃ, আর কেউ না হলেও, রমানাথ চৌধুরী বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছেন—

বাঁচবার মত বাঁচা? সে আবার কি! কথাটা যেন বিজ্ঞাপনের মতো শোনালো। বললাম—আমরা তাহলে কি অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি?

উনি মাথা নেড়ে হাসলেন, বললেন—রমানাথ অত্যন্ত পণ্ডিত। শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে জীবনটা গড়ে তুলেছেন। প্রায়ই পণ্ডিচেরী ছোটেন, ওঁর মুখে চোখে একটি দীপ্তি লক্ষ্য করোনি, আমাদের জীবনাদর্শ যেখানে কুয়াশায় ঢাকা, উনি সেইখানে পথ খুঁজে পেয়েছেন।

—কিন্তু যাঁরা যোগসাধনের বাইবে তাঁরা কি বেঁচে নেই? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সবাই যে যোগ সাধনা করবে বা করার ক্ষমতা আছে এ বিশ্বাস আমার নেই। অনেকের কাছে এটা পলায়নী বৃত্তি। যে-কোনো বৃত্তিই আমরা গ্রহণ করিনা সবই ত' সেই এক পথ ছেড়ে অন্য পথে পলায়ন। সবায়ের তাই বাঁচার ক্ষমতাও নেই, ওপরে আকাশ নীচে এই শহর, একবাব ভেবে দেখ মিনতি, অগণিত নব-নারী আর কারখানার উদ্ধত চিমনি, দারিদ্র্য আর নিষ্প্রাণতার প্রতীক মূক জনতা নীববে ঊর্ধ্বগগনে তাকিয়ে আছে—তাবা অসহায়, অথর্ব। দাসত্বের কথা ভাবো, মানুষ যোলঘণ্টার পর আঠারো ঘণ্টাও কাজ ক'রে চলেছে, আহার নেই নেশা আছে, স্বাস্থ্য নেই রোগ আছে, ঘরে মেয়েবা উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'বে চলেছে, অন্ধকার স্যাঁৎসেতে, আলোবাতাসহীন ঘরে বসে নিশ্চিত মৃত্যুকে আহ্বান করছে। মাতাল দুশ্চরিত্রের অসহায় সন্তান দল, কেউ অন্ধ, কেউ বধির, কেউ বা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত—এদের কষ্টটা ভাবো একবার, এর নাম কি বাঁচা?

ওঁর মুখ-ভংগিমা আমাকে যুগপৎ ভীত ও অভিভূত করে তুলল। ভুলে গেলাম আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে তিনি একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যাঙ্ক-কর্মচারী, আমার অধরোষ্ঠে যাঁর চুম্বন-স্পর্শ লেগে আছে ইনি তিনি নন—এই

সর্বপ্রথম কবি জয়ন্ত গাঙ্গুলীর মূর্তি আমার চোখে লাগল, যে জয়ন্ত জনসাধারণের, যিনি জনতার কবি, জনতার জয়গানে এই কবিই লিখেছিলেন :

এই সব বৈষম্যের দম্ভভরা গান
এ সবের হবে অবসান,
নূতন জীবন ওঠে জাগি—
নব নবীনের লাগি।
উদার অন্তরে তার জাগে দীপ্ত জীবনের আশা—
ললাটে জ্বলিছে বহ্নি তীব্র সর্বনাশা,
বাহুবলে টলে বজ্রপাণি,
ভুজঙ্গের ভুজের বাঁধন শ্লথ হয় পরাভব মানি।

বুঝলুম ওঁর ক্লেশ বা মনোবেদনা দুর্বল বা ভাবুকের ছিঁচকাঁদুনি নয়, বৈপ্লবিক যন্ত্রণার এ' এক অপূর্ব অভিব্যক্তি।

সেদিন এই দ্বিতীয়বার তিনি আমার কাছে আর একটি নূতন জগতের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। ওঁর অনুভূতি দিয়ে আমার কাছে এতকাল অজ্ঞাত এক নূতন জগতের ব্যথা ও বেদনা অনুভব করলাম, জ্বালা ও যন্ত্রণা, রোগ ও দৈন্য, দুর্দশা ও দুঃখ যেখানে চিরন্তন সেই সমাজের মধ্যে আমি আজ প্রবেশাধিকার পেলাম। যে সমাজে গাড়ি আর ভালো শাড়ির জন্য মানুষের মনে দুঃখ জাগে, যেখানে বিলাসটাই ব্যথার কারণ, সে সমাজের বাঁধা-রাস্তা ছেড়ে আমি নীচে এসে দাঁড়ালাম।

আমার মনে কিন্তু এতটুকু দ্বিধা বা সংশয় জাগেনি, একদিন এই পথে দাঁড়াব কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি, বাইরে থেকে ফ্রেমে বাঁধান ছবির মতো এই দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়েছি কিন্তু তার বেশী কিছু জানিনি, জানবার চেষ্টাও করিনি।

অনেকক্ষণ পরে ওঁকে প্রশ্ন করলাম—এই সব সমস্যার সমাধান কি? রমানাথ বাবুর কাছে কি উত্তর পাওয়া যাবে এই প্রশ্নের?

—জবাব আর কি? এই প্রশ্নের স্বত্বাধিকারিত্ব ত' আর নিজস্ব নয়, এ প্রশ্ন এখন সর্বদেশের, সর্বমানুষের। যে প্রাচীন রীতি ও পদ্ধতি শিশুকাল থেকে

এতদিন আমরা নির্বিবাদে গলাধঃকরণ করে এসেছি এঁরা শুধু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, নূতন দৃষ্টি-ভংগীতে বিচার করেছেন সব কিছু সমস্যার—

—কিন্তু আমরা শিশুকাল থেকে কি গিলেছি—?

—না, আমি মাঝে মাঝে ভাবি রমানাথ বাবুর আত্মোপলব্ধি ঘটেছে, অদ্ভুত এই লোকটি, আমার মুখে এই কথাটি শুনে তুমি নিশ্চয় অবাক হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু সত্যই যাকে বলে অবিনশ্বর আত্মা উনি যেন তাই পেয়েছেন। ওঁকে দেখলেই আমার 'দিব্য জীবন' কথাটি মনে পড়ে।

আমি বললাম—এ যে দেখছি একেবারে "পরলোক কি বাৎ", তুমি এ সব বিশ্বাস কর? এই প্রগতির যুগে এর কি কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে? ভিত্তি আছে?

উনি বললেন ঃ—বিশ্বাস কবি, বিশ্বাস করি সাধুজনের ধ্যান-ধারণাকে, বিশ্বাস করি ভারতের মাটির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা, জন্মান্তরবাদ, আর আত্মার অবিনশ্বরত্ব—'

অবিনশ্বর আত্মা! জন্মান্তরবাদ! জয়ন্ত বলে কি?—সূর্যালোকিত ধান-ক্ষেতের ওপর একটা ছায়া পড়েছে, বাতাস সহসা স্তব্ধ হয়ে গেছে, গাছের পাতা নড়ছে না। ভাবতে লাগলাম—মৃত্যু!—চিতা-বহ্নিতেই এই নশ্বর জীবনের কি অবসান? তারপর কি বিদ্রোহী আত্মা নিরলম্ব হ'য়ে শূন্যে ভ্রাম্যমাণ হয়,—অনন্তকাল ধ'রে অবিনশ্বর আত্মার জড়দেহে আনাগোনা? কি বিচিত্র কাণ্ড!

বললাম—আত্মার এই অমরত্বে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়ি।

উনি সবিস্ময়ে বললেন—সে কি, আতঙ্কের আবার কি আছে?

আমি বললাম—এ সব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে, আগে মরি তারপর কি হবে না হবে, কি হয় না হয় সে সব কথা চিন্তা করা যাবে?

উনি অট্টহাস্য করে উঠলেন, প্রাণখোলা দরাজ হাসি, গালে বেশ টোল খায়, চোখ দুটো হাসলে ছোট হয়ে যায়।

আমি একটু রেগে বললাম—এ কথায় এত হাসির কি আছে?

উনি বললেন—বোকা মেয়ে, মরার কথা কে বলেছে ? আমি ত' বাঁচার কথাই বলছিলাম, তারপর বললেন—দেখ দেখ—

দেখলাম অদূরে আকাশ একেবারে মাটিতে এসে মিশেছে, সুদূর দিগন্ত-প্রসারী শ্যাম শস্যক্ষেত্র আর একটি পাখি শূন্যে একটুকরো শুকনো গাছের ডাল ঠোঁটে ক'রে নিয়ে উড়ে চলেছে,—বাসা বাঁধবার আয়োজন।

উনি বললেন—জীবন! নূতন জীবনের অভিনন্দন বাণী সর্বত্র। মেঘ ও রৌদ্র, গাছ আর শ্যাওলা, পলাশ আর অশোক, পাখি আর বেজী, তুমি আর আমি—এ ত' সব সেই চিরন্তন জীবনেরই অভিব্যক্তি। আচ্ছা পাগল তুমি—মৃত্যুকে কি কেউ মনে রাখে ? কিছু চিহ্ন থাকে না।

—কিন্তু আমি ভাবছিলাম—'

—তোমার ভাবনাগুলো একটু থামাও, অতো অকারণ ভাবেনা—'

—তুমি ভাবোনা কারণে আর অকারণে ?

—সম্ভব হ'লে নিশ্চয়ই ভাবিনা, ভাববোও না। জানো ত' চিতা আর চিন্তার মধ্যে চিন্তাই সর্বনাশা।

আমি শুধু বললাম—কি জানি, আমি ত' কিছুই বুঝি না; এত কথার ভিতর শুধু বুঝলাম তুমি আর আমি—ঝড়ের মুখে খড় কুটো।

উনি আমার হাত দুটি সস্নেহে তুলে ধরলেন বুকের কাছে, ও'র মুখে সেই প্রসন্ন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি।

পাঁচ

চিরন্তন লোক

মহেশতলায় পৌঁছতে প্রায় বিকাল হ'য়ে এল।

দিনের বেলায় বাড়িটা বিশ্রী না হলেও কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। গত রাত্রে এই বাড়ি ছাড়ার পব কত কি ঘটে গেল—রূপালি রাতের পটভূমিতে যেন ধূসর রঙের একটি এচিং। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর আমার জীবনের কত পরিবর্তন হয়ে গেল,—এখনই বুঝলাম, যে সময়কে মানুষ ঘণ্টা ও মিনিটের পরিমাপে বেঁধেছে তা ট্রেন ধরবার সময় কাজে লাগলেও সময় পরিমাপ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

এই কয়েকটি ঘণ্টায় আমার এমন অভিজ্ঞতা ঘটল যে, যার ফলে শুধু আমার জীবন-নদীর গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'ল তা নয়, আমি যেন এই সময়ের ভিতর অন্তবিহীন পথ, বিভিন্ন প্রদেশ ও প্রান্তর পার হয়ে এলাম। এই বিস্ময়কর পরিভ্রমণ যেমনই বিচিত্র তেমনই বিস্ময়কর।

ওড়না ঢাকা নয়নে অরণ্যের সৌন্দর্য দেখেছি, সুদূরপ্রসারী মাঠের শ্যামলিমা, পারহীন সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি—বেজীর সলজ্জ গতিভংগী,—পাখির চঞ্চলতা—সমস্ত মিলে কি এক সামগ্রিক প্রকাশ। একই অনুপ্রেরণায় সকল প্রাণীর সমষ্টিগত পরিপূর্তি। আর একটি জগৎ দেখলাম, যে জগৎ ব্যথা ও বেদনায়, দুর্দশা ও গ্লানিতে ম্রিয়মাণ। আর দেখলাম আর এক জগৎ যা প্রাণরসে উচ্ছল, যে রহস্য-লোকে দুই-এ মিলে এক হয়, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে যে-জগৎ নিবিড় মিলনানন্দে বিভোর।

আর একটি জগৎও ছিল, আমি কিন্তু তার দ্বারপ্রান্তে এসে কুণ্ঠিত হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। তার নাম চিরন্তন লোক। তার কারণ, যে কোনোদিন ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুর সৌন্দর্য দেখেনি, সে কি ভাবে 'চিরন্তন লোকের' রহস্য উপলব্ধি করবে!

জয়ন্ত গত রজনীতে দৌড়ে এসে আমাকে বলেছিলেন: আমাকে একটু লিফট্ দেবেন? তারপর যান্ত্রিক গতিতে কয়েক ঘণ্টা কেটেছে, কিন্তু এই গাড়ি থেকে নামবার সময় আমার কেমন মনে হ'তে লাগল যে, দীর্ঘ দিনের ভ্রমণান্তে বাড়ি ফিরছি। চৌধুরীদের দেখার জন্য আমি মনে মনে অত্যন্ত ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছিলাম।

বাইরে কেউই ছিলেন না, তাই আমরা সোজাসুজি সামনের দোর ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম,—রান্নাঘরে থেকে মধুর সুবাস ভেসে আসছিল। রান্নাঘরের অন্ধকারে নজর ক'রে দেখলাম। মালতী মাসিমা কি একটা তৈরী করছেন। শীলাও সেই ঘরে আছে—আর বনমালী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কি একটা বিষয় নিয়ে ওদের ভিতর গভীর আলোচনা চলছিল, আমরা তার মধ্যে গিয়ে বাধা সৃষ্টি করলাম ভেবে কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ করলাম, জয়ন্ত কিন্তু সে সব ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে চললেন।

শীলা এগিয়ে এল, বললে—ও মা জয়ন্তদা—আরে, মিনতিও যে!

উনি বললেন—আমার গাড়িটার বন্দোবস্ত করতে হবে তাই উনিই আমাকে এক রকম নিয়ে এলেন, মেয়েটি ভালো কি বল?

—হতেই হবে, মুখখানি রাঙা দিদিমা বসানো যে—

জয়ন্ত এবার বললেন—আমার গাড়িটার কিছু বন্দোবস্ত হয়নি?

বনমালী এসে পাশেই দাঁড়িয়েছিল, বল্ল:—মধুমিস্ত্রীর কাছে দু'বার গিছলাম, দু'বারই এক জবাব, আর এক ঘণ্টা লাগবে।

একটু বিরক্তিভরে জয়ন্ত ব'লে উঠলেন:—না, নিজে না দেখলে কিছুই হয়না দেখছি, আমিই একবার ঘুরে আসি বরং। তারপর দরজার দিকে একটু এগিয়েই

থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন : বলতে যাচ্ছিলাম, কিছু মনে ক'রোনা, এখনই আসছি। ভুলেই গিছলাম মিনতি তোমাদেরই আপন জন, এ বাড়িতে আমার চাইতে ওর অধিকার অনেক বেশী।

মাসিমা হেসে বললেন : দুজনেরই সমান অধিকার। আমার চোখে তোমরা সবাই সমান।

শীলা বলে উঠল : ওর ভার আমি নিচ্ছি, আপনি বরং আপনার গাড়িটা দেখুন।

বোধকরি এই সর্বপ্রথম জয়ন্তের সংগে আত্মীয়তার যোগ অনুভব করলাম। যে দৃষ্টিতে উনি আমার দিকে তাকালেন তাতে এমন কিছু বৈচিত্র্য ছিলনা—তবু সেই মুহূর্তে কেমন মনে হ'ল এক ও অভিন্ন হয়ে গেছি। একটা নূতন প্রক্রিয়ায় যেন আমরা ভাবপ্রকাশ করতে শিখেছি, যে কোনো ভাষার চাইতে এই প্রক্রিয়া অধিকতর কার্যকরী ও চমকপ্রদ।

জয়ন্ত যেন বললেন : শোনো মিনতি! তোমার আমার ভিতর এক মহামিলনের সূত্র স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর আর কারো কাছে এই সম্পর্কের হয়ত মূল্য নেই, পাশের বাড়িতেই যাই বা পরজগতে তিরোহিত হই, আমাদের এই বন্ধনের গ্রন্থি শিথিল হবেনা।

আমিও সেই ভাব অন্তরে গ্রহণ করলাম।

শীলার দিকে তাকিয়ে বললেন : আসছি এখনই, দেরী হবেনা।

যে অপরূপ সৌন্দর্য সেই বসন্ত অপরাহ্নে এই মহেশতলায় লক্ষ্য করেছিলাম, ভাষায় তা প্রকাশ করার প্রচণ্ড বাসনা মনে জাগে, কিন্তু সে সামর্থ্য কই!

একবার জয়ন্ত অনুরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে সফল হননি, খেই হারিয়ে মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে বলেছিলেন : অসম্ভব, ভাষায় সব কথা কি প্রকাশ করা যায়, স্বচক্ষে না দেখলে কেউই উপলব্ধি করতে পারবে না আমরা কি দেখেছি।

সেই কালে অবশ্য আমার ও জয়ন্তর কাছে সব কিছুই ছিল সোনালি স্বপ্ন-সুষমা। সেই দিনের ছবি আঁকার চেষ্টাই করছি।

এর আগের দিন এমন সময় ঘুরেছি চৌরঙ্গী আর মার্কেটের বিলাস-বহুল পথে, সেখানে মোটর আর শাড়ির চাকচিক্য, অর্থ সেখানে অত্যন্ত সুলভ, সবাই নিজের সৌন্দর্যে বিভোর, অপরের দিকে তাকাবার অবসর নেই। আর আজ—সবই যেন অস্পষ্ট ছবি হয়ে গেল।

সহসা রমানাথবাবু বললেন: বাবাকে একটু খবর দিই, কাল রাতে উনি তোমাদের সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

—সেই উক্তি কি আকস্মিকভাবে মিলে গেল?—আমি ঠাট্টা করে বললাম।

রমানাথবাবু যেতে যেতে বললেন: কি জানি আমি বিজ্ঞানী, আমি কিন্তু ত্রিকালদর্শী নই।

শীলা বল্‌ল: তুমি জানোনা বুঝি, দাদা যে এবারে ডাক্তারী পাশ করেছেন, শীগ্‌গীর ধর্মতলায় ডিসপেনসারী খুলবেন।

—তাই নাকি! কি কাণ্ড!—আমি অবাক হয়ে বললাম।

শীলা বল্‌ল: কেন, এতে বিস্ময়ের হেতু কি?

বললাম: কি জানি কেন, উনি নাড়ি ধরে ক্যাস্টর অয়েলের বিধান দিচ্ছেন ভাবতে পারিনা।

শীলা বলল: ঐ কথাটি বলোনা ভাই, দাদার সইবেনা।

—কোন্ কথা?

—ঐ ক্যাস্টর অয়েল, ওটা ওঁর ধাতে সয়না।

—ওঃ, পছন্দ করেন না?

—বলেন ঐ ধরনের ডাক্তারির দিন শেষ হয়েছে। ওঁরা এখন অন্যভাবে চিকিৎসা করেন।

—বেশ মজা ত! এসব জানতাম না।

—দাদা অনেক কিছুই করেন, একজন জার্মান ডাক্তারের কাছে অনেক কিছু শিখেছেন, একেবারে রোগের মূলে চলে যান, বাহ্যিক উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করেন। ওঁর ধারণা অধিকাংশ রোগেরই দেহ ও মনের অনৈক্য থেকে উৎপত্তি।

—অদ্ভুত!

—হয়ত অদ্ভুত, হয়ত নয়। তোমার হয়ত চোটে গেলে মাথা ধরে, তার কারণ তোমার মন ও দেহে বিরোধ, রক্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে তার ফলে মাথা ধরে—এমনই—

—তাহলে উনি কি ক্যাস্টর অয়েলের পরিবর্তে মাথাধরা সারানো বড়ি দেন?

মাথার চুলগুলি হাত দিয়ে সরিয়ে নিয়ে শীলা বলে: একরকম তাই। যাতে তোমার মনে আবার শান্তি ফিরে আসে তারই চেষ্টা করেন! কারণ হার্‌মনি বা ঐক্যের অভাবেই ত' তোমার মন খারাপ হয়েছে, আর তার থেকেই ত' মাথাধরা।

আমি বললাম: না বেশ লাগছে। তারপর শীলা, মনের ঐক্য কি ভাবে আসবে?

—সবাইকে ভালোবাসতে হবে, কারো উপর রাগ রেখোনা, তোমার কিছু কেউ নিয়েছে, কেউ তোমাকে বঞ্চিত করলো, তুমি চট্‌লে—মনে হ'ল তার টুঁটি চেপে ধরি—

—কি করবে? সেই ভালোবাসার ধনটিকে ছেড়ে দিয়ে, নিঃশব্দে বসে থাকবে? কেমন যেন অস্পষ্ট লাগছে।

শীলার মুখভংগী বদলে গেল—একটু সংযত হয়ে বল্‌ল, দেখ ভাই, তোমার ভালোবাসার ধন যদি চলেই যায়, তাকে আটকাবে কিসে?

—পারবো না?

—হয়ত পারবে, কিন্তু তাতে কি খুব সুফল হবে?

—প্রশ্নটা ভালো, কিন্তু আমি ত' অসম্ভব কিছু দেখছি না।

শীলা গম্ভীর গলায় বল্‌ল: জানো না।—

"যাবার যা তা যাবেই যাবে
না খুলে দিলে দ্বার,
ক্ষতির সাথে মিলাযে বাধা
করিবে একাকার।"

কাউকে তুমি বাঁধতে পারো না, সে যে ঘৃণা করবে!

বললাম: এর জবাবে কি বলেন রমানাথ বাবু। সবাইকে ভালোবেসে যাও কিন্তু মেজাজ ঠিক রেখো—?

শীলার চোখে হাসি ফুটলো, মুখটি কিন্তু গম্ভীর। সে শুধু বললে—জানো দাদার জার্মান ডাক্তার স্ট্রাডবার্গ বলেছিলেন, এ অবস্থা হ'লে তাঁর আর একটিও রোগী থাকবেনা—

বললাম: জানো শীলা, সবটাই বাইবেলের মত শোনাচ্ছে, এত প্রেম কি জগতে আছে?

শীলা বল্‌ল: ঠিকই বলেছ—শুধু দু হাজার বছরের তফাৎ। এই যে জয়ন্তদা আসছেন—

উনি এলেন, শুকনো চুলে পড়ন্ত রোদ লেগে চমৎকার দেখাচ্ছে।

এতক্ষণে সব যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল, শীলার পানে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সব বুঝলাম, হয়ত অচেতন অনুভূতি—কিন্তু আমার চোখে কিছুই অস্পষ্ট ও আবছা রইলো না।

শীলা ও জয়ন্ত, আশ্চর্য! হয়ত হেসে উঠতাম।

সেই প্রাচীন প্রাচীর ধরে শীলা দাঁড়িয়ে আছে, মুখে বিষণ্ণতার কালো ছায়া। ওর চুল, ওর মুখ, সবই দেখছি। প্রসাধনহীন দেহ, সস্তাদরের ব্লাউজ, আর ওর হাতের আঙুল—যাতে পালিস নেই, রঙ নেই—

জয়ন্ত কি ওকে সহজ দৃষ্টিতে দেখে? গত রজনীর কথা, সেই তারা ভরা আকাশের নীচে জয়ন্তর স্পর্শ—সবই যেন আমার অঙ্গে তখনও লেগে আছে।

শীলা! শীলাও' জয়ন্তকে জানে, দীর্ঘ দিনের জানা শোনা। ওদের ভিতর কি ভালোবাসা আজো আছে? এই ত' শীলা বলছিল—জোর ক'রে কাউকে বাঁধা যায় না—জয়ন্ত কি তবে শীলাকে ছেড়েছে!

কি ছিল আর কি ছিল না, জানি না, আমি ত' ওঁকে পেয়েছি। আমার মুখেই ত' উনি চুম্বন-রেখা এঁকেছেন,—আমার হাতখানিই ত' কাল তুলে ধরেছিলেন।

মনটা কেমন আত্মগৌরবে ভরে উঠল। যেন বিজয়িনীর আনন্দ। এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। এক সময় ও সহজে জানবে, আমি না বললেও বুঝবে আমাদের এই হৃদয়ের বিনিময়ের কথা—ওর সেই বেদনা হয় ত চিরন্তন হয়েই থাকবে।

অথচ আমিই শীলার সংগে একত্রে আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যেই এত দূরে এসেছিলাম।

কিন্তু শীলা কি আমার শত্রু! সে সব হারিয়েছে আর আমি সব পেয়েছি!

কেনই বা আমি শীলার জন্য ভাবব, জীবনে ক'বারই বা ওকে দেখছি, আর কতটা দেখব—কোথায় থাকবে ও, কোথায় আমি?

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যেন বড় রাস্তায় বহুমূল্য কিছু কুড়িয়ে পেয়েছি। গতকাল যদি শীলার অবস্থা বুঝতাম আমার মন এতটুকু বিকৃত হ'ত না। এখন কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে—বিগত রজনী ও এই মুহূর্তের মধ্যে ব্যবধান অনেক।

আনন্দ মুখর 'মহেশতলা ভবন' সেদিন বেদনা-ম্লান হয়েই রইল। কিছুতেই আর জমলো না পূর্বরজনীর সেই উদ্দাম উচ্ছলতা।

আমরা আসার সময়—সবাই সেই ভাবেই এসে দাঁড়ালেন। শীলাও এল—কিন্তু—শীলার মুখখানি যেন পাথরের—

গাড়ির ভিতর আমাদের মুখেও হাসি এল না—

দীর্ঘ পথ আমরা নীরবে পার হয়ে এলাম।

ছয়

সর্বনাশের নেশা

এ কথা কোনোদিন মনে মনে ভাবিনি যে, আমার ব্যক্তিগত জীবন বা বিবাহ সম্পর্কে বাবা বা মার কোনো মতামত থাকতে পারে, এবং তাঁরা সেই সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। এ কথা মনে জাগেনি, গর্ব বা অহমিকা ব'লে একটি জিনিষ আছে যা জীবনের অনেক অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে সহসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সামাজিক বা সাংসারিক মর্যাদা—যা অহমিকার নামান্তর, এর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য কি মূল্য দিতে হয় আর কত অন্যায় আমরা করে থাকি, কে তার হিসাব রাখে! আর মজা এই, আমরা কত কৌশলে কতখানি চাতুরীর সংগেই না এ সব করে থাকি।

অপরকে স্বমতে আনার জন্য আমরা বলি—নিজেদের জন্য ভাবিনা, শুধু তোমার মুখ চেয়েই বলছি, তোমার কষ্ট, তোমার অপমান, তোমার দুর্দশা এ আমাদের সইবে না। আমরা স্বচক্ষে দেখবো তোমার সেই ক্লেশ, তার চাইতে বরং মৃত্যুই শ্রেয়।

সব সময়েই ঠিক একভাব নয়, এক এক সময় প্রকৃত উদ্বেগও থাকে, কিন্তু এও এক প্রকার বলপ্রয়োগ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত করার জন্য জোর দেওয়া, নিজস্ব বিশ্বাসের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া।

আমাদের বাড়ির সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে জয়ন্ত একবার বলেছিলেন—

তোমাদের বাড়ির কথা যতই শুনি ততই আমার মাথা ধরে, তোমার বাবা যে আমাকে ফুলের মালা দিয়ে ও শঙ্খধ্বনি ক'রে বরণ ক'রে নিতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার নেই।

বলেছিলাম—বাবা কিছুই বলবেন না, তিনি এতই ব্যস্ত অত শত দেখার তাঁর অবসর কই। আর মা—আমার দ্বারিকবাবু প্রভৃতিদের কথা মনে পড়্‌ল। বললাম—মা'র এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় হবে না।

ভুল করেছিলাম,—এত ভুল সাধারণতঃ মানুষের হয় না।

সেদিন প্রভাতে মা বাগানে নতুন ধরণের ডেক্ চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, পাশে খবরের কাগজটি পড়ে আছে। মা কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক—কি যেন ভাবছিলেন। সেই প্রভাতী রোদে তাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছিল।

আমি যেতেই মা তাড়াতাড়ি কাগজটি তুলে বললেন—দেখ্‌ দেখ্‌, লেডী লতিকা গাঙ্গুলীর ছবিটা কি বিশ্রী উঠেছে, যেন বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে। দ্বারিক এলে দেখাতে হবে।

ভাবলাম,—মা বেশ আছেন। দ্বারিক, লতিকা গাঙ্গুলী, রমা দাস, মিসেস হাজরা, এই নিয়েই ত ওঁর জগৎ। কোথাও এতটুকু খুঁত নেই, গায়ের চামড়া, মাথার চুল, চোখের ভ্রু, হাতের নখ, পায়ের জুতো—সবই নিখুঁত। সহসা দেখলে বয়স অনুমান করা শক্ত।

লতিকা গাঙ্গুলীর ছবিওলা খবরের কাগজটি টিপয়ের ওপর রাখতে রাখতে বললাম—মা, আমি শীগ্‌গীরই বিয়ে করব স্থির করেছি।

মা চোখ ছুটি বিস্ফারিত ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—মি ন তি!

মার এই বিস্ময়ের আধিক্যে আমার হাসি পেল। বললাম—অবাক লাগছে?

মা সজোরে মাথা নেড়ে বললেন—খুকী, তোর বিয়ের বয়স হয়েছে? বলিস্ কি, আমি শ্বাশুড়ি হব?

—শীগ্‌গীরই সব অভ্যস্ত হয়ে যাবে মা, সবই সয়ে যায়। ওঁর মনের মধ্যে কি

বিভীষিকা খেলে যাচ্ছিল ভাবছিলাম। মা কি তাঁর আসন্ন প্রৌঢ়ত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন, আতংকিত হলেন ওঁর দ্রুত ও সৌখীন জীবনের সম্ভাব্য অবসান আশংকায়! ফুল যেমন ঝরে যাবার পূর্ব মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায়—এও কি তাই?

এমনই ভাবছিলাম, মা সহসা প্রশ্ন করলেন—পাত্রটি কে? নাম কি? তাড়াতাড়ি সারবার উদ্দেশ্যে বললাম—চিনবেনা, এমন কেউ হোমরা চোমরা নন, নেহাৎই একজন কবি—নাম জয়ন্ত গাঙ্গুলী, ব্যাংকে চাকরী করেন, আর শুনেছি কবিতা আর রাজনীতি চর্চা করেন।

—কি বল্‌লি—কবিতা? মানে পদ্য লেখে? মার মুখে এতখানি বিস্ময় ও অবজ্ঞার ভাব যেন আর কখনও দেখিনি। মুখ-ভংগীমা সম্পর্কে মা খুব সতর্ক, কারণ কোথায় নাকি পড়েছেন ওতে মুখের ওপর কুঞ্চিত রেখা ফুটে ওঠে। এখন সে সব কথা মনে হলেই···

—হ্যাঁ, পদ্যই লেখেন, কেন?

মা সোজা হয়ে উঠে বসলেন, বললেন—ব্যাংকের কেরাণী বল্‌লি, না—?

ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ, তাইত' বললাম। মা তাচ্ছিল্যভরে হেসে বললেন—বদ্ধ পাগল তুই। তারপর আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে কাগজটি হাতে তুলে নিলেন।

এমন ভাবে হাসলেন যেন এই প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি।

আমি এইবার দৃঢ়কণ্ঠে বললাম—না পাগল হইনি, বেশ সজ্ঞানেই কথা বলছি।

—এর চেয়ে পাগলামী আর কি হবে? এর চেয়ে যদি বলতিস্‌ যে, হাওড়ার পোল থেকে লাফিয়ে পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে তাহলেও আমি এত আশ্চর্য হতুম না।—আমার আর কিছু বলার ছিল না, তাই চুপ করে রইলাম।

মা আবার বললেন—এই প্রেমিক ব্যাংক-কেরাণীটির আর কি কি গুণপনা আছে বলে যাও, শুধু চল্লিশ টাকা বেতনেই দিন চলে যায়?

ভীষণ রাগ হ'ল,—গৌরব ও গরিমাময় সব কিছুই কি ধুলোয় ফেলে দিতে হ'বে? প্রেম, সৌন্দর্য, আশা, বিশ্বাস সবই কি বিচার করা হবে অর্থের পরিমাপে, অর্থই কি সর্বশ্রেষ্ঠ মাপকাঠি? দেবতার দেউলেও কি বসে থাকবে পোদ্দারের দল? রাগে, দুঃখে, অভিমানে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল।

মা বললেন—ভেবেছে ভাল মক্কেল পেয়েছে, বাপের এক মেয়ে, টাকারও অভাব নেই, আমাদেরই কোনো ব্যাংকের কর্মচারী নাকি?

ইংগিতটা এমনই কুৎসিত যে, আমি তার উত্তর দিলাম না।

মা ব'লে চলেছেন—ব্যাংকের কেরাণী, কি ভাগ্যিস বলিসনি যে, সাঁওতাল বা আদিবাসী। তাতে তবু একটু ওরিজিন্যালিটি থাকত—

তারপর একটু থেমে বললেন—এই উৎসাহী ব্যক্তিটির সংগে কোথায় তোমার আলাপ হ'ল, আজকাল বুঝি কমউনিষ্টদের দলে ভিড়েছিস্?

—মার্জিত লোক হলেই যদি কমউনিষ্ট হয় তাহ'লে ইনিও কমউনিষ্ট,—তবে কোনো দলে বা আসরে ওঁর সংগে দেখা হয়নি,—দেখা হয়েছে শীলাদের বাড়ি, তাদের অনেকদিনের পরিচিত বন্ধু—

—হ্যাঁ, তাই হবে। শেফালী না শীলা কি বল্লি—তাদের সংগেই ওকে মানাবে ভালো—

ও আর এক জগৎ, যে জগৎ সম্পর্কে মা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! সেখানে কারা থাকে, কি করে, কি তাদের মূল্য—কিছুই মা'র জানা নেই। মহেশতলার কথা আমার চোখের সামনে ভেসে এল।

সে জগৎ আর এ জগতে কি বিরাট পার্থক্য! বিচিত্র জগৎ—!

তোমার এই ব্যাংক ক্লার্কটি কাল যদি জানতে পারে যে, পৈতৃক টাকা ভিন্ন তোমার আর কিছুই নেই, এই বিবাহের ফলে সেই সম্পত্তি থেকে তোমার বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনা আছে, তাহ'লে হয়ত তার উৎসাহ একটু নিভে আসবে!

বললাম—মা তুমি অতি নিষ্ঠুর ! এই কথাগুলি শুনতেও আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি রামকে না বিয়ে ক'রে যদি শ্যামকেই বিয়ে করি তাতে কি এসে যায় তোমাদের। কতটুকু ক্ষতি হবে তোমাদেব এ আমি বুঝি না।

—অনেক কিছু এসে যায় মিনতি। আমি তোমার মা, তুমি আমার মেয়ে, কোন্ বাপ-মা চান যে, তাঁদের মেয়ে একটা বাজে লোকের সংগে ভেসে বেড়াবে। তোমার যদি মাথা খারাপ হয়ে থাকে আমাদের কর্তব্য তার চিকিৎসা করা—না নির্বাক দর্শক হয়ে তোমার আত্মহত্যা ও নিশ্চিত মৃত্যু দেখা ?

এর পর কথা চলে না, কোনো কথাই বলা চলে না। মার কাছ থেকে আমি পালিয়ে এসে আমার ঘরটিতে বসে সমগ্র ব্যাপারটি চিন্তা করতে লাগলাম—সত্যই ত' মার এত মাথা ব্যথা কেন ? মা ত' কোনোদিনই আমার জন্য এতটুকু উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। ছোটবেলায় যখন শান্তিনিকেতনে পড়তুম তখন ছুটিতে মাকে দেখবার জন্য প্রাণে কতই না বাসনা জাগত। রাতে মাকে স্বপন দেখতুম, ওঁর সুন্দর মুখ, সোনালি চুল, ঢল ঢল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে যেন হাসছেন। ঘুম ভেঙে গিয়ে যখন কিছুই দেখতে পাইনি তখন কেঁদেছি। যখন বাড়ি ফিরেছি তখন শুনেছি মা গিয়েছেন কার্সিয়ং বা গোপালপুর-অন-সী।

আমি যদি গোলাপ হালদারের সংগে যেতাম—কিংবা জগদীশ চক্রবর্তীর মোটরে ঘুরতাম—তা'হলে মা এতটুকু উদ্বিগ্ন হতেন না, বিরক্ত হতেন না, দেখেও দেখতেন না। কিন্তু যেহেতু আমি একজন অর্থহীন নিম্নমধ্যবিত্তকে বিয়ে করতে চাইছি ওঁর মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে, কারণ এ ভদ্রলোকের না আছে বিত্ত বা বৈভব, না আছে খ্যাতি বা প্রতিপত্তি।

আমার বিস্ময়ের এইখানেই শেষ হ'ল না,—অদৃষ্টে কষ্ট ছিল—বাবা মা'র চাইতেও কঠোর ও দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর বক্তব্য শোনালেন। সাধারণতঃ বাবা শনিবার বাড়ি থাকতেন না, কিন্তু সেই শনিবার যখন শুনলাম, বাবা আজ বাড়িতেই থাকবেন, তখনই ধরে নিয়েছিলাম, আজ আমার বিষয়টি নিয়ে কথা উঠবে। নীরবে

এ কথা নিশ্চিত যে, আমার মনে মনে একটা ধারণা হয়েছিল যে উনি কি বলবেন বা বলতে পারেন। বাবার মুখের পানে তাকিয়ে সহসা আমার মনে হ'ল উনি ধনী-ব্যবসায়ী ও ব্যাংক-বিশারদ উমাপতি চৌধুরী নন—একজন রক্ষণশীল, গোঁড়া মধ্যবয়সী বৃদ্ধ মাত্র।

বাবা বললেন—তোমার মার কাছে কি যেন শুনছিলাম, কে এক ছোকরা—

বাবা চোখ নামিয়ে চুরুট নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগলেন। আমি বললাম —হ্যাঁ—তাঁর সংগেই আমার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। বাবা মাথা নীচু ক'রেই রইলেন, পিছনের চুলে ঢাকা তাঁর মাথার ছোট্ট টাকটি চক্ চক্ করতে লাগল। আমার কেমন যেন কষ্ট ও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

—তোমার মা বললেন ছেলেটি নাকি কেরাণী, হয়ত আমারই কোনো ব্যাংকের কেরাণী?

—হ্যাঁ বাবা, মা ঠিকই বলেছেন।

বাবা এইবার আমার মুখের দিকে আবার তাকালেন—বেশ ভালো ক'রে তাকালেন; বললেন—বিয়ের সব ব্যবস্থাই কি ঠিক হয়ে গেছে? মানে, বিয়ে কি করতেই হবে?

খেতে খেতে বাবা মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমি যেই উঠে দাঁড়িয়েছি ব'লে উঠলেন—মিনতি?

আমি মুখ ফিরিয়ে বললাম—কিছু বলবে বাবা?

বাবার খাওয়া শেষ হয়ে গিছল। মুখ ধুয়ে সিগারটি দাঁতে কেটে ধরাবার উদ্যোগ করছিলেন, তারপর সহসা যেন মনস্থির ক'রে নিয়ে আমাকে কিছু বলতেই হবে এই ভেবে আমার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করতে লাগ্‌লেন। আমি তাঁর চোখের পানে তাকিয়ে মাথা নীচু করলাম।

কেন যে এত সব লক্ষ্য করছিলেন জানিনা—বিশেষতঃ এই মুহূর্তে। তবে

ইচ্ছা হ'তে লাগল—বাবার মনের কথাটা বুঝি—বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ভগবান! তারপর বললেন—ভালো লেগে থাকে তার সংগে ঘোরা ফেরা করতে বা মেলামেশা করতে আমি নিষেধ করি না। তোমার অর্থের অভাব নেই, তাকে ভদ্রভাবে থাকার ব্যবস্থাও তুমি করে দিতে পারবে,- কিন্তু—বিয়ে। ভুলে যাও মা, ভুলে যাও—'

জয়ন্তর মুখখানি মনে পড়ল, তাঁর সেই হাসিখুসীমাখা মুখ। দৃঢ়কণ্ঠে তাই বলে ফেললাম—তা হয়না বাবা—বিয়েই হবে আমাদের—

বাবার মুখভংগী পবিবর্তিত হয়ে গেল, বেশ বুঝলাম বাবা ভেবেছিলেন আমাকে রাজী কবিয়ে মাকে গিয়ে বলবেন—সব ঠিক হযে গেছে—খুকীকে বুঝিয়ে বলেছি। ভালো বিপদেই পড়েছিলুম যা হোক—'

কিন্তু আমার অনমনীয়তা তাঁকে পীড়িত করে তুলল।

বাবার মুখ কঠিন ও কঠোব হয়ে উঠল।

বাবা শুধু বললেন—তুমি একটি গাধা, আর সেই ছোকরাটি একটি ভণ্ড জোচ্চোর—

আমার সহ্য-সীমা অতিক্রান্ত হ'ল। কোথা থেকে এত সাহস এল জানিনা, সজোরে বললাম—চুপ করুন! আপনি ও মা কেন এই বিয়ের বিরোধী তা বলবেন? আমি হয়ত গাধা নই, লোকটিও জোচ্চোর নয়। আপনারা তাকে কেউই জানেন না—দেখেন নি আব আমি যে কি তা আমি নিজেই জানিনা—

বাবা চেয়ারটা ঠেলে সবিয়ে দিযে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন—আমাব এত সময নেই যে, আজে বাজে লোকের সংগে বসে বসে আলাপ করি। তুমি কি বল্‌তে চাও যে, আমার সারা জীবনের রক্ত-জল-করা সঞ্চয় এমন একটা লোকেব হাতে গিয়ে পডবে যার শিক্ষা—ফাষ্ট বুকের ঘোড়ার পাতা পযন্ত? আমার সোফার যে টাকা রোজগার করে, সেটুকু

জীবিকা অর্জনেও যার সামর্থ্য নেই, সেই হবে আমার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী—বলো কি তুমি—?

—আপনি বুঝছেন না বাবা, অন্য দিক থেকে আপনি সমস্ত ব্যাপারটির ভুল বিচার করছেন। এই ভালোবাসা সাময়িক মোহ নয়, বা আপনার অর্থ ও সম্পদের উপর আমাদের কোনো লোভও নেই—আমরাই আমাদের জীবন গড়ে তুল্‌বো—'

—ছাই হবে—ছি ছি এই তোমার রুচি? টাকার ওপর টাক্ ক'রে লোকটা শেষে তোমাকে পথে বসাবে, আমার মাথাটা হেঁট হবে।

পুনরায় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁর কাণে আমার কথা পৌঁছল না। বুঝলাম বাবা বা মাকে প্রেমের সম্পর্কে কিছু বলা বৃথা—এই এক জায়গায় উভয়ের মিল রয়েছে।

বাবা তারপর বলতে লাগ্‌লেন—প্রেম, ভালোবাসা—যতো সব—'

এমন সব জঘন্য ইংগিত বাবার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, বুঝলাম নর-নারীর মিলন অর্থে দৈহিক মিলন বা যৌন-সম্পর্ক ভিন্ন আর কিছুই বোঝেন না। ভেবে দেখলাম খুব বেশী দোষও ওঁদের নেই। ওঁরা কথাটা একটু স্থূলভাবে প্রকাশ করেছেন এই যা। সারা পৃথিবীতে, সকল কালে, সকল যুগে এই যে পারস্পরিক ভালোবাসা, অপরের আনন্দে নিজের আনন্দ কামনা—অন্তরংগতার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, সমগ্র জীবন ও সৌন্দর্যের একাত্মতা—এ সবই ত' সেই দৈহিক মিলনের আনুষঙ্গিক অংশ।

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে,
গুণে মনভোর,
প্রতি অংগ লাগি কাঁদে
প্রতি অংগ মোর।"

এই কথাগুলির ভিতরই সকল কথা বলা শেষ হয়েছে। চিরদিন মানুষ এই

অতীন্দ্রিয় প্রেমের কদর্য ব্যাখ্যা করেই এসেছে। স্থূল যৌন-মিলনের বহিরঙ্গ প্রকাশে ও যৌন কামনায় নিজেদের অন্তরকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

বাবা ও মার মধ্যে পরস্পর প্রেম না থাকলেও যৌন-আকর্ষণের অভাব ছিলনা। আজ চল্লিশেও আমার মায়ের যা রূপ—আঠারো-বিশে তাঁর কি সৌন্দর্য ছিল তা কল্পনা করা শক্ত নয়। ঠিক তার বাইরে তাঁরা কেউই যেতে পারেন নি। দৈহিক কামনার শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে ঊর্ধ্ব জগতে উঠতে পারেন নি, আজ তাই অশান্তি ও অস্বস্তির আগুনে জ্বলে মরছেন দুজনেই।

এই কারণেই ওদের জীবন অসার্থক হয়ে উঠেছে। বাবার সঙ্গী হয়েছে মদের বোতল আর মার সঙ্গী দ্বারিকা প্রভৃতি বন্ধুবর্গ। আর এই অবস্থার কারণ অতি সরল এবং সাধারণ। আমরা চাই বা না চাই, বিশ্বাস করি বা না করি, বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি-রহস্য সার্থক করার জন্য পারস্পরিক প্রেমের প্রকাশ প্রয়োজন, ভালোবাসা নিতে ও দিতে হয়—কারণ প্রেমই জীবন, প্রেমহীন নর-নারী মমির মত কফিনে বদ্ধ হয়ে স্বীয় দেহের অন্ধকারেই ঘুরে মরে।

আমরা চাই ভালোবাসা, কারণ আমরা ভালোবাসায় বিশ্বাসী, আর সেই কারণেই ভালোবাসা চাই। ভালোবাসার যেখানে অভাব সেখানে আশ্রয় নিই সুর বা সুরায়। উত্তেজনার আগুনে পতঙ্গের মত পুড়ে মরি। কিছু একটু নিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে থাকি।

অনেকক্ষণ পরে বাবা বললেন—মিনতি, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি যে পথ ধরেছ, তা যে শুধু ভুল তা নয়, এই হ'ল সর্বনাশের পথ। আজ তুমি সর্বনাশের নেশায় মেতে উঠেছ।

মনে হ'ল, আমি যেন অসীম সমুদ্র-তরঙ্গে পাথরের বুকে আছাড় খেয়ে মরছি, কিছুতেই তার হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারছি না। বাবা আমাকে সত্যই ভালো বাসতেন, কিন্তু তাঁর সে ভালোবাসার চাইতেও অনেক বড় তাঁর প্রেসটিজ, সামাজিক মর্যাদা, সেখানে স্নেহের কোনো স্থান নেই।

অতিকষ্টে মুখ থেকে আমার কথা সরল। বললাম—বাবা, কোনো উপায় নেই, সর্বনাশের পথ হয়ত নয় তবে দুঃখের পথ হ'তে পারে, আশীর্বাদ করুন হাসিমুখেই যেন সে পথে আমি চলতে পারি। বাবা কোনও জবাব দিলেন না, চশমাটা খুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন, আমার অবাধ্যতায় ব্যথা পেয়েছেন বুঝলাম, অনেকক্ষণ পরে বললেন—

—বেশ, তাই হবে, বয়স হয়েছে তোমার যেভাবে তোমাকে প্রতিপালন করেছি তারপর ত' তোমাকে আমি বেঁধে রাখতে পারিনে। তোমার বোঝা উচিত ছিল, না বুঝতে পারো, না বোঝ তার ফলও যেদিন তোমার বিয়ে হবে সেদিনই পাবে।

আমি অতিকষ্টে বললাম—জানি,—মানে এই রকমই আশা করে'ছিলাম।

আমার মুখের দিকে উনি কঠোরভাবে তাকালেন, তারপর অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন। যেটুকু জানবার বা বোঝবার ছিল তা এই হাসির ভিতরেই বুঝে নিলাম। বাণীতে যা ছিল প্রচ্ছন্ন হাসিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাবা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। চীৎকার ক'রে বলে উঠলেন,—এই সংবাদ তোমার সেই ব্যাংকের কেরাণীটিকে বোলো। তারপর বোঝা যাবে তোমাদের প্রেমের ব্যাপার কতদূর গড়ায়। সে যখন শুনবে তোমাকে বিয়ে ক'রে তার একটি পয়সাও লাভ হবে না তখন সেই লম্পট অন্যত্র ছুটবে। তোমার কাছে আর একটু বুদ্ধি আমি আশা করেছিলাম। সে হতভাগা তোমাকে একটা দাসী চাকরাণী ভেবেছে আর তুমিও পাকা আমটির মতো তার হাতে গিয়ে পড়েছো। তারপর আমার দিক থেকে অত্যন্ত ঘৃণাভরে মুখ সরিয়ে বললেন, চল্লিশ টাকায় দিন কাটাতে চাও যাও, শুধু পরে বোলোনা যে, বাবা আমাকে সাবধান ক'রে দেয় নি।

জয়ন্তকে যখন এইসব কথা বললুম তিনি বললেন,—বাঃ, লোকে বলে কবিরাই হলো খামখেয়ালী তাদের ভংগী নাটকীয়। আরো কত কি।

আমরা আমাদের অতি পরিচিত সেই ছোট্ট রাস্তাটি দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই পথেই আমাদের সেই গাড়ির বাতি খারাপ হয়ে গিছল। সেইখানেই দূরের আকাশ মাটীতে গিয়ে মিশেছে।

আমি বললাম—সমস্ত জিনিষটা কেমন গুলিয়ে গেল। অন্ততঃ বাবার কাছ থেকে আমি এ অসম্মান আশা করিনি। এ যেন সেই মধ্যযুগের মনোবৃত্তি।

উনি বললেন—মধ্যযুগ নয়, মধ্যযুগ নয়, এ হ'ল মার্কিন, আর হিব্রু, আর গ্রীসিয়ান আর মিশরীয় রীতি। প্রকৃতপক্ষে কেইন্ আর এবেলে চলে যাও।

সবিস্ময়ে বললাম—অর্থাৎ ?

উনি হেসে বললেন—অর্থাৎ ভগবৎভীতি ও আত্মপ্রীতি। এই ভগবান অতি ঈর্ষাকাতর। এমনকি চৌধুরী মশাইও ভয় পেয়েছেন। পাছে এই নিন্দুক দেবতা আমার স্পর্শে কষ্ট হয়ে আশিস্ বর্ষণে বঞ্চিত করেন।

—তুমি টাকার কথা বলছ ?

—নিশ্চয়ই, অর্থেই ত' অনর্থ। আমরা হলুম সেই ভাগ্যহীন লক্ষ্মীছাড়ার দল—যাদের সংস্পর্শে সাগর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। যত লোকে পায় ততোই ত' তার হারাবার ভয়। যেমন ধর্ম। প্রথম ধাপে উঠতে না পারলে বড়ো জোর লোকে তাচ্ছিল্য ক'রে একটু হাসে। কিন্তু যে শেষ ধাপে পৌঁছবে তার কাছে ব্যাপারটি অত লঘু নয়।

বললাম—তোমার কি মনে হয় ওরা চায় আমি সুখী হই। শান্তি পাই।

তাই চায়—তবে সুখের ও শান্তির নিরিখ এখানেও যে টাকাটাই সব। যেন জীবনটাকেও চিনে নেবার অধিকার রয়েছে টাকার। ওদের রাগ হয়েছে কেন জান ? রাগ হয়েছে তার কারণ তুমি সুখী হতে চেয়েছ একজন দরিদ্রের হাত ধ'রে। এইটিই হ'ল সবচেয়ে নোংরামী।

পরে হয়ত বৃষ্টি হবে। আকাশের এক প্রান্তে একখানা মেঘ ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। বাকী আকাশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। মনে হচ্ছিল প্রতিটি ঘাসের ডগাও

স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রেখে হাওয়ায় দুলছে, প্রায় তিন মাইল দূরের একখানি কুঁড়ে ঘর এমনই সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, তার প্রান্ত রেখাগুলি যেন তুলি দিয়ে আঁকা ব'লে মনে হয়।

অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম, কিন্তু সংসারে টাকারও ত' প্রয়োজন? টাকাকে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা এক পা চলতে পারি কি?

—কে বললে পারব? সে বড কঠিন পথ। তবে আমিও ত' আর হালছেড়ে বসে নেই।

আমি বললাম—আমার কি ইচ্ছে জান, তুমি ব্যাংকের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে সমস্ত সময় লেখা আর পডার মধ্যেই ডুবে থাক।

ওদিকে মুখ না ফিরিয়েই ওঁব মুখে যে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে তা আমি অনায়াসে বুঝলাম। উনি বললেন—তাই নাকি—

আমি বললাম, বুঝেছি কিছু বোলো না। আমি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে একটা ক্ষতের উপর হাত দিয়ে ফেলেছি। উনি একটু হাসলেন।

বললেন—বোকা মেয়ে, আমার ত' মনে হয় তা হ'লে ভালোই হবে, ঐ সব ডিসিপ্লিন আর নিয়মকানুনের বিধিনিষেধ আমার সয় না। আর তা হ'লে চাকরী ছেড়ে দিয়েছি ব'লেই লেখবারও একটা প্রেরণা পাব।

তারপর অস্তমান সূর্যেব দিকে আনমনাভাবে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু তোমার কি হবে? পারবে কি তুমি দাসী চাকরহীন সংসারে রাঁধুনী, ঝি ও গৃহিণী হয়ে দিন কাটাতে? এখনও তোমার চলে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

আমি হেসে ধীব কণ্ঠে বললাম কিন্তু রাঙা দিদিমার কথা মনে আছে ত'?

—সে অন্য যুগেব কথা। এ যুগ আর সে যুগ! অনেক প্রভেদ। তখন জল তুলতে কাট কুডিয়ে উনুন জালাতেই প্রাণান্ত হ'ত।

তাছাড়া একজন বলেছিল আমার হাতগুলি নাকি চমৎকার।

কি মিথ্যাবাদী।

নিশ্চয়ই বলেছিলো।

তুমি দেখছি আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও যে, তোমার হাতদুটো খুব সুন্দর। এ যেন ছোট ছেলেকে লোভ দেখিয়ে হাত পাতানো। তার পরেই একটু থেমে সহসা উনি বলে উঠলেন—দেখ আর দেরী করা চলে না। শীঘ্রই আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে হবে। আশীর্বাদ অদৃষ্টে জোটে ত' ভালো। না জোটে বিধাতার অদৃশ্য আশিসে অভিষিক্ত হব। মার দিন নষ্ট ক'রে লাভ কি, যদি কিছু ঘটে যায় তখন আর আক্ষেপ ও অনুতাপের সীমা থাকবে না।

সবিস্ময়ে তাকালাম। বললাম—কি হবে?

উনি সে প্রসংগ চাপা দিয়ে বললেন, কিছু নয়। এমনই বলছিলাম।

আমি বললাম, দিন কিছু স্থির করেছ?

—সামনের সপ্তাহে?

—আরো বেশী সময় দরকাব নয়?

—ঠিক জানি না, জেনে নোব?

—কিন্তু কোথায় থাকব?

—ব্যবস্থা একটা হবেই। আশ্রয় একটা মিলবেই। দারিদ্র্যে তোমার ভয় নেই তো?

মার কথা ভাবলুম, বাড়ির কথা ভাবলুম। কিন্তু ওঁর আন্তরিকতা ও প্রীতিরসে ভরা মুখখানি সবই ভুলিয়ে দিল।

সাত

আমাদের ছোট ঘর

তার একমাস পরে একদিন বিয়ে হয়ে গেল। আমি যেন ভিক্টোরিয় যুগের নায়িকা। এই একমাসে একটি একটি ক'রে আমার অধিকাংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরিয়ে এনে আমাদের নূতন বাসায় রাখলাম। জয়ন্ত ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বললেন—আমি যেন একজন তৃতীয় শ্রেণীর প্রবঞ্চক। তোমায় ভুলিয়ে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে আসছি। তাই উনি বাবার সংগে সামনা-সামনি দেখা ক'রে একটা বোঝাপড়া করার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন।

আমি নিরস্ত করবার জন্য বললাম—তুমি গেলে গণ্ডগোল আরো বাড়বে, জটিলতার অবসান হবে না।

উনি অত্যন্ত বিরক্তিভরে বললেন—ভারী বিশ্রি লাগে আমার। এভাবে লুকোচুরি আর সয় না—

আমি বললাম—জানি। কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? আসল কথা হ'ল তুমি আর আমি। নূতন ধারায় বইবে আমাদের জীবন। আমরা ঠিক চলে যাব। ওরাই পিছনে পড়ে থাকবে। আমরা ওদেরও আমাদের সংগে টানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা যদি না আসে সে দোষ ওদের, আমাদের নয়। আমরা যদি ওদের কথা শুনি তাহ'লে সেই হবে আমাদের চরম আত্মবঞ্চনা—

উনি হাসলেন, বললেন—তোমার জিভে মধু আছে, আমি কেন বৃথা নর্দমার অনুকৃতি করি।

আমি বললাম—নদীর কথা ভাব। নদী যদি পাহাড়ে উঠতে না পারে তাহ'লে সে পাহাড়টি ঘিরে ঘুরে চলে।

উনি বললেন—মেয়েরা বড় অবান্তর কথা বলে। কোথায় নর্দমার কথা হচ্ছিল আর কোথায় নদী। আমি আমাদের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষ্যে একটা কবিতা লিখেছি তোমাকে শোনাব—

আমাদের ছোট এই ঘর—
পাখিরা বাঁধিছে বাসা, ঝরনায় জল ঝ'রে পড়ে,
পুরানো দেওয়াল হতে মাঝে মাঝে মাটি খসে ঝড়ে,
ওদিকে শুখনো পাতা পড়ে ঝর্ ঝর।
ভালোবাসি ছোট এই ঘর।

আমাদের ছোট এই ঘর—
পৃথিবীর পথে একা আমরা দুজন,
সারাদিন উভয়ের কপোত কূজন,
রঙীন আকাশ আর ম্লান অধর—
জগতের সেরা ছোট ঘর॥

পণ্ডিতিয়া রোডের বাসা তুলে দিয়ে সার্কাস অঞ্চলের এই ঘর দুটি অতিকষ্টে সংগ্রহ করেছেন জয়ন্ত। অনেক দিনের বাড়ি। আগে ছিল পার্শীর, এখন মালিক একজন বয়িয়সী বিধবা। সাহেবী ধরণের বাড়ি। সেই হিসাবে জানলা দরজাগুলো একটু লম্বাচওড়া। শোওয়ার ঘরে বসার ঘরে ভেদাভেদ নাই। সামনে একটু ছোট বারান্দা। কাঠের সিঁড়ি ওপরে যেখানে গিয়ে মিশেছে সেখানে একটুখানি আড়াল দিয়ে রান্নাঘর তৈরী করে নেওয়া হয়েছে। ফলে সিঁড়ির ওপর কেউ এসে দাঁড়ালে সর্বাগ্রে তার রান্নাঘরটি নজরে পড়বে। আর গলির মধ্যে বারান্দায় দাঁড়ালে সামনে ডাব আর সরবতের দোকান তার পাশে ছোট্ট একটি প্রাচীন

মসজিদ। আর কিছু দূরে অনেকগুলি কৃষ্ণচূড়া গাছ। লালে লাল হয়ে আছে। যেন বনে আগুন লেগেছে। ভিতর দিকে কার্নিসের ফাঁকে ফাঁকে গোলা পায়রার বাসা। ছাতের এক কোণ থেকে জল পড়ে বোঝা যায়। সেদিকের হলদে দেওয়াল শ্যাওলায় কিঞ্চিৎ নীল হয়ে আছে। এই ভাল। পণ্ডিতিয়ার বাড়ির চাইতে ভাড়া কিঞ্চিৎ বেশী। একটা নতুন খবরের কাগজে সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরী জুটেছে। তারই উপর যা ভরসা। চারিদিক প্রদক্ষিণ করে জয়ন্ত অপরাধীর মত শুকনোমুখে বলে, নেহাৎ মন্দ নয়, কি বল ?

আমি বললাম—অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ? এ সেই পুরানো বালীগঞ্জ। এখন বেহারী ও পশ্চিমা মুসলমানের ভীড় হলেও আগে ত' বনেদী ব্যারিস্টারদের এই ছিল স্বর্গ।

—বাড়িটা যেমন তেমন হোক, পাড়াটার আভিজাত্য আছে।

আমি বললাম—যে আভিজাত্যকে আমরা ভুলতে চলেছি তাকে আবার টেনে আনা কেন ?

উনি বললেন,—যে ভাবে তুমি মানুষ হয়েছ, যে আবহাওয়ার ভেতর এতদিন কাটল তারপর এই দুঃখ-দুর্দশা আনন্দের পরিবর্তে তোমার মনে জ্বালা ধরিয়ে দেবে।

সহসা রাঙা দিদিমার কাহিনী মনে পড়ে গেল। বললাম—কিন্তু রাঙা দিদিমার কাহিনী ভুলে গেলে ?

উনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

উনি বললেন,—সোমনাথের কথাই ঠিক। চরিত্রে ও আকৃতিতে হয় ত' তুমি তাঁরই প্রতিমূর্তি।

—হয়ত তাই। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ?

—হয়ত তাঁর মতন তোমাকেও তাই সমাজ সংসার ছেড়ে আসতে হচ্ছে।

—অন্ততঃ এখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া খুব সাধারণ ঠেকছে না।

সহসা ওঁর মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর হয়ে উঠলো। উনি বলে উঠলেন—তুমি ফিরে যাও, এখনও ফিরে যাও মিনতি। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও আনন্দ, পোষাকের পারিপাট্যই তোমাদের সব। তুমি এখানের নও, ওখানের। সেখানে আছে মোটা কার্পেট, আলো আর জৌলুষ।

আমারও রাগ হোল। বললাম—সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কে না ভাবে? এই ত' সেদিন অর্থ-সম্পদের কথা বলতে তোমারও জিভের ডগা সজল হয়ে উঠেছিল। এখন দেখছি তুমি একটি ভণ্ড। এইভাবে কথা বললাম, কারণ নইলে হয়ত আমি কেঁদে ফেলতাম।

উনি বললেন—ভণ্ড আমি নই মিনতি। বিধাতাই জানেন আমি কি! তবে যে সব নির্বোধ মনে করে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য একটা অপরাধ, আমি তাদের দলে নই।

আমি বললাম—আমাকে তুমি ভোলাতে পারবে না।

উনি বললেন—তাই নাকি?

আমি ওঁর এই মুখভংগী আর সহ্য করতে পারলাম না। ওঁর হাত ধরে বললাম—আমাকে ধ'রে মারলেও আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না। কেন তোমার এত ভয়। তুমি জান এর মধ্যে থেকেই আমাদের পথ ক'রে নিতে হবে। নিজেও একশবার সে কথা বলেছ। এ যে শুধু নেহাৎ আকস্মিক তা নয়। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

ওঁর মুখ খুব গম্ভীর। বললেন—হয়ত আছে মিনতি। আমাদের মধ্যে এমন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে যার দ্বারা আমাদের প্রতিটি গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সে যতই অকিঞ্চিৎকর আর কষ্টকর হোক না কেন। মুস্কিল হয় যখন আমরা তার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াই।

—তবে কেন আমায় তুমি ফিরে যেতে বলছ!

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপরে বললেন—হয়ত আমি ভীরু তাই ভয়

পাচ্ছি। কারণ হয়ত আর সবাইএর মত আমিও তোমাকে সব কিছু সংকটের নাগালের বাইরে রাখতে চাই, হয়ত—

আমি চীৎকার ক'রে বললাম—তোমার 'হয়ত' আর 'কারণ' থামাও। একদিন তুমি বলেছিলে, ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শুধু বেঁচে থাক।

ওঁর মুখে আবার সেই পুরানো হাসি ফিরে এল দেখলাম।

—কেন যে তোমাকে সব কথা বলে ফেলি—। এই ব'লে উনি ওঁর হাতখানি আমার কাঁধের ওপর রাখলেন।

জয়ন্তদের খবরের কাগজ বেরোতে আর কয়েক দিন বাকী। এর মধ্যেই বিয়ের হাংগামা চুকিয়ে ফেলতে হবে।

মহেশতলার মাসিমাই শুধু আমাদের মতলব জানতেন।

তিনি তাই বললেন—রাঙা দিদিমার মতন বিয়েটা এই গ্রামেই সেরে ফেললে ভালো হয়। সেইত এক জায়গায় বন্দোবস্ত করতেই হবে।

লক্ষ্য করলাম শীলা একটিও কথা বল্‌ল না। আমি ভাবলাম এতেই বা কি এসে যায়। আমার ধারণা ছিল রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়ে তিন আইনে বিয়ে হবে। কিন্তু জয়ন্ত বললেন—সেটা হবে নেহাৎ ব্যাংকের পাস বুকে নাম লেখানোর মতো। সুতরাং যথারীতি আনুষ্ঠানিক বিবাহের একটা বন্দোবস্ত হ'ল। শুভদিন স্থির হ'ল। বাড়ি থেকে বিদায় নেবার আগের রাত্তিরটা বড়ো বিশ্রীভাবে কাটলো। আমার বিশ্বাস, মা আমাদের বিয়ের কথা একদম ভুলে গিয়েছেন। কারণ তিনি একথার কোনদিন উল্লেখ করেন নি। যে ক'দিন বাবার সংগে দেখা হয়েছে, তাঁর চোখে একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তিনি আমাকে কোন কথাই বলেন নি।

সেই সন্ধ্যায় একসংগে বসে চা খেলাম। মা দ্বারিকের কথায় ভরপুর। দ্বারিকবাবু একটা চমৎকার নাটক লিখেছেন। থিয়েটারওলারা যদি না নেয় মা নিজেই খরচখরচা দিয়ে নিউ এম্পায়ারে শো দেখাবেন। ভাবতে আশ্চর্য

লাগে যে, মা তাঁর সমস্ত জ্ঞান এই দ্বারিকবাবুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। দ্বারিকবাবুর মতন একজন ভাঁড় যে-সমাজে আসন পায় সেই সমাজেই জয়ন্তর মতো কবিদের খাঁচার মধ্যে ব'সে আট ঘণ্টা চাকরী করতে হয়। আর তার বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যায় তাতে কাগজ, কালী, ক্ষুধার অন্ন, আর বাড়িভাড়ার সংস্থান হয় না।

তবু আশ্চর্য এ সংসারে দ্বারিকরাই করুণার পাত্র, জয়ন্তরা নয়।

মা তাড়াতাড়ি সাজসজ্জা ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

আমি জানলার ধারে ব'সে জয়ন্তর কথা নয়, ফেলে আসা অতীতের দিনগুলির কথা ভাবতে লাগলাম। প্রথম দিন স্কুলে যেতে কিরকম ভয় পেয়েছিলাম। রাতে দরজা জানলা-বন্ধকরা অন্ধকার ঘরে হাঁপিয়ে উঠতাম। অন্ধকারের ভয়ে নয়—অন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে। এক এক সময় ভাবতুম, আমার বাবা মা হয়ত আমার নিজের বাপ-মা নয়, আমার প্রকৃত বাপ-মা নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবেন, আমাকে হাত ধ'রে নিয়ে যাবেন। ভাবতাম নদীর ধারে ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘর। নদীর জল এসে আছড়ে মরছে দেওয়ালের গায়ে। আমি হাঁপিয়ে উঠছি।

অন্ধকার হয়ে যাবার সংগে সংগে টেলিফোনে ঘণ্টা বেজে উঠল। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল—

—হ্যালো, আজ ফিরলুম, খবর কি ?

আশ্চর্য এত লোক থাকতে গোলাপ হালদার হঠাৎ এই মুহূর্তে ফোন করল কেন ?

বললাম—ভালোই।

—কাল সকালের দিকে মাঠে এসো না, কথা হবে।

—তা হয় না, আমাকে সকাল সকাল উঠতে হবে, আমার বিয়ে।

বলার ইচ্ছে ছিল না মোটেই, তবু কেমন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—কি বললে ? বিয়ে বিয়ে শোনাল না ?

—হ্যাঁ তাই ! দোহাই তোমার, একথা এখন চাপা রেখো।

—কিন্তু কে এই—বন্ থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে ?

—হয়ত তাই, বনের পাখিই বটে। তারপর জয়ন্তর কথাই বললাম।

গোলাপ হালদার ঠাট্টা ক'রে বল্‌ল—লাখপতি উমাপতি চৌধুরীর মেয়ের এ কি পরিণাম ! খবরের কাগজে কেলেংকারী বেরুবে। তোমার বাবা কি বলছেন ?

—বলছেন নয়, বলেছেন। বলেছেন, এ ঘটনা ঘটলে ওঁর বাড়ি, ঘর যেন কলংকিত না করি।

শুনলাম গোলাপ হেসে উঠল। গোলাপ বলল—নাতিটিকে নিয়ে যখন পথে এসে দাঁড়াবে তখন ওরা কোলে তুলে নেবে। কিন্তু কখন কোথায় বিয়েটা হবে ?

—অনেক দূরে, গ্রামে, কেউ জানতেও পারবে না।

—তাই নাকি ? অন্ধকারে আলপিন পড়ে থাকলেও আমি খুঁজে নিতে পারি। তুমি কি চাওনা যে আমি যাই ?

—তা নয়, তবে—

—কিন্তু এ সময় সাহায্যেরও ত' প্রয়োজন ?

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম—মহেশতলা ব'লে একটা জায়গা আছে জান ?

গোলাপ হেসে বললে—তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না আমার ছোট পিসিমা ওর কাছাকাছি অর্থাৎ বজবজে থাকেন। আমি নিশ্চয়ই যাচ্ছি।

গোলাপের গলার স্বরে আন্তরিকতার সুর ভেসে উঠলো।

আট

অদৃশ্য শৃঙ্খল

সেদিনকার সকালটা ছিল ছায়া ঘেরা। আকাশ সকাল থেকেই পাতলা কুয়াশায় ঢাকা, তার ভিতর দিয়েই সোনালি সূর্যালোক আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছিল। গ্রামগুলি যেন পাতলা ওড়নায় জড়ানো। পথের ধারে যে দু' একটি দোকান পড়ে সেগুলির ঝাঁপ তখনও বন্ধ। পুকুরগুলোর ওপর স্বচ্ছ ধোঁয়ার মত কুয়াশা।

সুনিপুণ শিল্পীর তুলিতে আঁকা দৃশ্যপটের মত মাঝে মাঝে একটি ছোটখাটো বাড়ির বর্হিরেখা দেখা যায়। বিরাট একটি পুকুরের একপাশে প্রকাণ্ড এক শিবমন্দিরও দেখলাম।

পরিচিত পথেই আমাদের গাড়ি চল্‌ছিল। আজ পর্যন্ত বাড়ির গাড়ি ব্যবহার করছি। আগামী কাল থেকেই ওর ওপর আমার আর কোনো অধিকারই ত' থাকবে না। অবশেষে মহেশতলা গ্রামের ছোট্ট বাজারটির কাছে এসে পড়্‌লাম। বেপারীরা পথের ওপরেই আলু-বেগুন সাজাতে বসেছে। দিনের কাজ সুরু হোল।

'মহেশতলা ভবনের' গলির বাঁকে দেখি জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওঁকে দেখে গাড়ি থামিয়ে সামনে দাঁড়ালাম, কি যে বলি ঠিক করতে না পেরে বললাম—শুভদৃষ্টির আগে দেখা হওয়া কিন্তু ঠিক নয়। জানো না?

ওঁর স্বভাবসিদ্ধ ভংগীতে হেসে বললেন—একেই বলে কুসংস্কার! নাও

নেমে পড়—এখনও ভালো ক'রে ভোর হয়নি। এই ব'লে গাড়ির দরজাটা খুলে দিলেন।

আমি বললাম—তিনটে বাজতেই উঠে পড়েছি। বিছানায় আর শোয়া গেল না।

—দেখো এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে মতটা পালটাতেও পারো।

আগেও এমনই অনেক কথা হয়েছে তবু আজকের দিনটিতে কথাটির যেন অনেক অর্থ—

বললাম—প্রয়োজন নেই, কিন্তু তোমার— ?

—আমারও সেই মত।

কিছুক্ষণ উভয়ের মুখেই আর কথা নেই, আমি ওঁর উড়ন্ত চুলগুলি লক্ষ্য করতে লাগলাম। সহসা উনি ব'লে উঠলেন—তুমি আসার পর কোথা দিয়ে কি যে ঘটল বুঝি না, জানো জীবনে কোনো দিন ঘর বাঁধবো মনে করিনি। এই বয়সেই দেশের কাজ করতে গিয়ে অনেক বিচিত্র মানুষ আর বিভিন্ন দলের সংস্পর্শে এসেছি। অনেক কিছুই দেখলাম। শিখলামও কিছু।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বলতে সুরু করলেন—

জানো মিনতি, এইসব মহৎ কাজের ক্ষেত্রেও সাধুর সংগে আছে অনেক অসাধুর ভীড়। তারা কেবল ব্যক্তিগত সুবিধাটুকুই খোঁজে। আর দেখেছি নির্লোভ মানুষের দধিচীর মত আত্মত্যাগ। আমার জীবনে এইটাই পরম লাভ। তাঁদের চরিত্রবলই আমার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তাই ভাবছিলাম একি হ'ল, হঠাৎ একটা কাগজের ফুলের মত ফ্যাসনেবল মেয়ের মোহে আমিও জড়িয়ে পড়লাম। কারণটা যেন প্রায় স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আবার সব কোথায় মিলিয়ে গেল।

প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, কবে থেকে তোমার মনে এই দেশ সেবার বাসনা জেগেছে ?

উনি একটু থেমে ব'লে উঠলেন—সে এক দীর্ঘ কাহিনী, তবে বোধকরি আজকের দিনে তোমাকে শোনবার মত। সংক্ষেপে কিছু জানিয়ে রাখি, পরে আরো হয়ত জানতে পারবে—সেকেণ্ড ক্লাসে যখন পড়ি, আমার এক সম্পর্কিত মামা কয়েকখানি বই পড়তে দিলেন, 'কানাইলাল', 'ফাঁসীর সত্যেন,' ইত্যাদি, সেই অল্পবয়সে বইগুলি আমার মনকে বেশ নাড়া দিয়ে গেল। এর আগে নন-কো-অপারেশন আন্দোলনের অতি মৃদু ঢেউ আমাদের শিশুমনে একটা ছোঁয়াচ জাগিয়েছিল, ক্ষেত্র তৈরী ছিল, তাই একদিন নিজের বুকের রক্ত দিয়ে দলের প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম লেখালাম।

এমনই মজা পুলিশও ঠিক খবর পেয়ে গেল। তারপর—তারা আমাকে চিরদিন জালিয়ে আস্‌ছে। একদিন স্কুলেও তারা এসে খাতপত্তর দেখে গেলো। বাবার কানে কথাটা উঠ্‌তে তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে অনেক বুঝিয়ে সব শুনে নিয়ে বললেন—দেখ বাবা, পথটা বড় কঠিন, অনেক ভালো ছেলের জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে আমি বারণ করি না, আবার তোমার কাজটায় ঠিক উৎসাহ দিতেও পারছি না। তবে যা সত্য ব'লে বুঝেছ, অন্তরে যার প্রতিধ্বনি পেয়েছ, তার সাধনা যদি নিষ্ঠা সহকারে করতে পারো, একদিন তার মূল্য পাবে। তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সেই থেকে এ পথ আর আমি ছাড়িনি। যা সত্য ব'লে মনে করি তার জন্য কোনো ক্লেশই আমার কাছে বড় নয়।

বিবাহ করা না-করা সম্পর্কেও মনে একটা দ্বন্দ্ব ছিল, সে দ্বন্দ্ব কেটে গেছে কস্তুরবাকে স্বচক্ষে দেখে। গান্ধীজীর সকল কাজে, সকল সংগ্রামে তিনিও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সকল ক্লেশ সহাস্যে বরণ করেছেন। আজ তিনি নেই, তাঁর কাজের ভার অপরে নিয়েছে। তুমিও হয়ত যা অপূর্ণ তা পূর্ণ করতে পারবে। হয়ত পারবে তোমার বিলাসের ফাঁস থেকে মুক্তি নিয়ে আমার কাছে ধরা দিতে।

বলেছিলাম—জানি না, কি পারবো আর কি পারবো না, তবে ধরা যখন

দিয়েছি তখন ত' আর পালাবার পথ নেই। বিবাহটা ত' স্বাভাবিক ব্যাপার, সবাই বিয়ে করছে, তার দায়িত্বও তাদের।

—নিশ্চয়ই। কিন্তু এতবড় ব্যাপারটাকে মানুষ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ ক'রে এনেছে। এটা একটা উৎসবের উপলক্ষ্য মাত্র। তবু—'

উনি কপাল কুঁচকে হাসলেন।

প্রশ্ন করলাম—তবু কি?

—না, ভাবছিলাম এর পিছনে কত কথা রয়েছে, কি অপূর্ব ইতিহাস। একশো বছর আগে আমাদের মতই দুটি নব-নারীর এইখানেই দেখা হয়েছিল আর মিলনও ঘটেছিল। সেইখানেই আজ আমরা দাঁড়িয়ে। আজ সেই অতীতকে স্মরণ করো—আরো একশো বছর পরে আবার দুজন অজানা নর-নারী হয়ত এমনই এসে দাঁড়াবে, নিত্যকালের এই খেলা চলেছে, সমগ্র ব্যাপারটি যেন একটা অদৃশ্য শৃঙ্খলে বাঁধা। লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে তোমার মা আর মালতী মাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ওদিক থেকে তিনি আস্‌ছিলেন, একটি মুহূর্ত এদিক ওদিক হ'লে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও এই ভাবে মুখোমুখি এসে ওঁরা দাঁড়াতেন না, আর সেই অঘটন না ঘট্‌লে আজ তুমি আর আমি এভাবে পাশাপাশি এসে দাঁড়াতে পারতাম না। তবু ওঁদের দেখা হয়ে গেল। দেখা হবেই, এমনই বিধাতার বিধান।

—সত্যি এ কথা স্বীকার ত' করতেই হবে। তবু আমরা ভাবি আমরাই সব কর্‌ছি।

—তাই ভাবি বটে, বিশ্বজনীন ব্যবস্থা অনুসারেই এই লীলা চলেছে। কার্পেটের প্রতিটি স্থতার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনই সব আয়োজন পরিপূর্ণ করতে প্রয়োজন আমাদের, আমাদের নিয়েই সে আয়োজন সম্পূর্ণ হবে। দাবা খেলার ছক দেখেছ, সেই ছকে আমরা এক একটি খুঁটি।

—কিন্তু এদিকে যে নতুন খেলার সময় এগিয়ে এল, ওরা আবার খুঁজতে আসবে না ত'?

—ঠিক ত', ভুলেই গিয়েছিলাম, আজ আমাদের বিয়ে। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কি হবে, তার চেয়ে বরং এইখানে দাঁড়িয়ে গল্প করার ভিতর অনেক আনন্দ আছে।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম—এ এক পলায়নী মনোবৃত্তি। এখন সারা জীবনটাই ত' পড়ে রইলো কথা বলার জন্য—

—আর সেই সারা জীবন ধ'রে তোমাকে ভালোবাসতে হ'বে, কি কঠোর! ওঁর মুখে সেই দুষ্টুমী-ভরা হাসি।

কয়েকঘণ্টা পরে—

মহেশতলার চৌধুরীদের প্রাচীন দোলমঞ্চে এসে বসেছি। এইখানেই একশো বছর আগে রাঙা দিদিমার বিয়ে হয়েছিল, এইখানেই তাঁরা পরস্পরকে আজীবন সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই সেই দোলমঞ্চ, আমরাও সেই দোলমঞ্চে এসে প্রণাম জানালাম। এইখানেই একদিন চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ তাঁর ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানিয়েছিলেন, সেই সংগে মিশিয়ে ছিল তাঁর মনের কামনা।

প্রাচীন দোলমঞ্চটি সেদিন নতুন ক'রে দেখলাম। বাংলার কারিগরের হাতে তৈরী অপূর্ব শিল্পকর্ম, সেই দোলমঞ্চেই মাসীমাদের পারিবারিক প্রথানুযায়ী আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

মহেশতলা ভবনে ভোজের আয়োজন হয়েছিল, নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম, তবু সমারোহের আর যেন শেষ ছিল না, ফুলে ফুলে সমস্ত বাড়িটা ভরে গেছে।

কাল ও চোখের জলের স্পর্শে সেদিনের স্মৃতি আমার মন থেকে আজো মুছে যায়নি। হাসি ও চাপা গলার আওয়াজ, ফুলের মৃদু সৌরভ, আর আমার পাশে জয়ন্ত।

শীলার বোন শেফালী এসে দাঁড়িয়েছে, তার পাশে সব মাথা ছাড়িয়ে সেই দীর্ঘ-

দেহ মানুষটি। শেফালী বল্‌লে—এদিক ওদিক করছিল এই লোকটি, ধ'রে নিয়ে এসেছি। তোমাকে নাকি চেনে! মিথ্যে কথা না?

গোলাপ বলে উঠ্‌ল—আমি কখনও মিথ্যা বলি না। মিনতি, তোমাকে যেন গগন ঠাকুরের ছবির ঘোমটা-ঢাকা পরীর মত দেখাচ্ছে—

শেফালী বল্‌ল—আমি মনে করছিলাম নন্দলালের আঁকা দুর্গাপ্রতিমা। গোলাপ শেফালীর দিকে এমন ভাবে তাকাল যে দৃষ্টি আমার অতি পরিচিত মনে হ'ল।

শেফালী ও গোলাপ—হায়রে! আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম। কিন্তু শেফালী ত' তেমন ফ্যাসনদূরস্ত মেয়ে নয়। সেতার বাজায়, ছবি আঁকে বটে তবু, যেন গ্রামের মেয়ে। গোলাপ—যাক্‌গে একথা ভেবে আমার লাভ কি? আমার জীবনেও ত' এমন ঘটনা ঘটেছে যা ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে বলা যায় না, গোলাপেরও জীবনে হয়ত সেদিন এসেছিল। জয়ন্তের মধ্যে আমি যা পেয়েছি, শেফালীর মধ্যে গোলাপ হয়ত সেই জিনিষই আবিষ্কার করেছে। জয়ন্তই ত' বলেছে যা ঘট্‌বার তা ঘট্‌বেই, এমনই নিয়ম প্রকৃতির।

কাল রাতে আমি ত' গোলাপকে টেলিফোন করিনি, আমি ত' ওকে জানাতে চাইনি বিয়ের কথা।—

ওঁর সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বললাম—ইনি গোলাপ হালদার—অনেকদিনের জানাশোনা—

উনি প্রতিনমস্কার জানালেন গোলাপকে—বেশ সহজ ভাবেই। তারপর কে যেন ওঁকে ডাক্‌লো, গোলাপ আমার কাছে এগিয়ে এসে বল্‌ল—হতাশ হয়েছি, একি! লম্বা চুল কই, চাদর কই? মিহিসুরে কথা নেই,—একেবারে আধুনিক কবি!

শেফালী পিছন থেকে এসে গোলাপের হাত ধ'রে বল্‌ল—আর ফাজ্‌লামো করতে হ'বেনা, এসো দেখি, পরিবেশন করতে হবে।

গোলাপ একেবারে সেণ্ট বার্নাডের মত পিছু নেয়।

শীলা এসে দাঁড়িয়েছে, পরণে একখানি নীল শাড়ি, মুখে তার হাসি চোখেও যেন শাড়ির রঙ, কেমন যেন উদাস তার ভংগী। এই জনতার ভিতরও সে যেন নিঃসঙ্গ।

আমি বললাম—শীলা, আজকের এই দিনটির জন্য আমি তোমার কাছে ঋণী। তুমিই সব করলে—'

—সবাই ত' মেতে আছে ভাই, মা-বাবা, শেফালী, ছেলেরা এমন কি বনমালী পর্যন্ত। আমি একা কি আর করলাম ?

—অথচ ছ' মাস আগে তোমাকে একরকম জানতামও না।

—না।

—একদিন আমিও যদি তোমার জন্য কিছু করতে পারি, তবেই সব সার্থক হবে।

কিন্তু ঠিক ঐ কথাটা বলতে চাইনি, বলতে চেয়েছিলাম—জয়ন্তের ওপর তোমার টান্‌টা আমি ধরে ফেলেছি, এখন নিশ্চয়ই আমাকে তোমার ভারী খারাপ লাগ্‌বে—প্রতি মুহূর্ত তোমার কাছে বিষিয়ে উঠছে, হয়ত আমাকে ঘৃণা করছ, কিন্তু আমার জন্য ফুল তুলে আনছ—অথচ বলতে পারলাম না।

ম্লান হেসে শীলা বল্‌ল—হ্যাঁ, তবে হয়ত এখনও কিছুদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

নয়

সমুদ্রের ঢেউ

পুরীর স্বর্গদ্বারে একখানি ছোট বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। রমানাথ বাবুরই কোনো মক্কেলের বাড়ি। কল্‌কাতার কোলাহল, আর আমাদের সমাজে এই বিবাহ-সম্পর্কিত নানাবিধ কানাকানি থেকে কিছুদিন বাইরে থাকার বাসনা ছিল। ওঁদের খবরের কাগজ বেরোতে তখনও কিছু দেরী ছিল, তাই এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া হ'লনা।

সমুদ্রের প্রায় ওপরেই বাড়িটা। কাছাকাছি মাত্র কয়েকটা বাড়ি ছড়িয়ে আছে, দিন-রাত খালি সমুদ্র-গর্জন আর সমুদ্রের হাওয়া।

স্বর্গদ্বার!

তখন আমি সামান্য দুধ জ্বাল দিতেও জানতাম না, একথা ভাবতেও আজ বিস্ময় জাগে মনে।

উনি বললেন—আমি ত' বলেছি তুমি একটি কাগজের ফুল। তবে শীগ্‌গীরই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম—আচ্ছা, তুমি এমন রাঁধতে শিখ্‌লে কি ক'রে? এটা ত' আর পুরুষের কাজ নয়—

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উনি বললেন—জানো, তুমি বালিশের তলায় 'আচার ব্যবহার' সম্পর্কে একটা

বই রেখো। পুরুষরাও রাঁধবে না কেন? কোনো বাধা নেই। প্রয়োজন হলে সবই করতে হবে। আগস্ট আন্দোলনে যখন পথে প্রান্তরে লুকিয়ে বেড়িয়েছি তখন কে আমায় রেঁধে দিয়েছে। সাত বছর বয়সেই বাবা আমাকে ছোটখাটো রান্না শিখিয়েছিলেন, তখন কি জানতাম একদিন তার সুফল মিল্‌বে। গ্রামের কোনো অনাথাকে ডেকেও রান্না করিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু বাবা তা পছন্দ করতেন না। রাঁধতে পারি ব'লে আমার পুরুষত্ব ত' ক্ষুণ্ণ হয়নি—দুধটার দিকে লক্ষ্য রেখো—

দুর্বল গলায় বলি কি আবার দেখ্‌বো?

—পোড়া কপাল! দুধটা পড়ে না যায়, দুধ ফুটলে উছলে পড়ে, জানো না?

এই কথা ব'লে উনি কপালে হাত দিলেন।

আমার লজ্জার আর সীমা রইলো না, সেইদিন থেকেই কোমর বেঁধে রান্না শিখতে লেগে গেলাম।

এখানকার সবাই দেখি ওঁকে জানে, আগেও কয়েকবার উনি এসেছেন। আমার দিকে কিন্তু সবাই তাকিয়ে থাকে,—নিশ্চয়ই কানাকানিও করে।

তাতে কিছু এসে যায় না, দিনের পর দিন সিনেমার দৃশ্যপটের মত দ্রুত চলে যায়। জীবনে সেই প্রথম প্রেমের দিনগুলি আনন্দ ও উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কোথায় চলে যায়। সামনে যে রূঢ় রুক্ষ বাস্তব কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে কথা সেদিন মনে হয়নি।

এখনকার এই দুর্দশা ও দুঃখ-জর্জর দিনগুলিতে বসে অতীতের সেই শান্তি ও স্বস্তিভরা দিনগুলির কথা স্বপ্নের মত মনে পড়ে। বেশী দিনের ত' কথা নয়, তবু সেদিন মানুষের মনে যেন এদিনের চাইতেও বেশী শান্তি ছিল, অন্তরে আনন্দ ছিল,—শান্ত নদীর মত ছিল জীবন।

আমরা হাত ধরাধরি ক'রে পথ চলেছি, সমুদ্রে স্নান করেছি, বিকালে বালির

ওপর বসে শিশুদের মতই প্রাসাদ গড়েছি। এইখানেই সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখেছি, প্রতিটি জলকণা যেন সূর্যদেবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, আমরাও প্রণাম জানালাম।

কোনোদিন সমুদ্রতীরে বসে সমুদ্রের বিচিত্র ঝিনুক কুড়িয়েছি, নুলিয়ারাও কিছু কিছু এনে দিয়েছে, শিশুর হাতে আঁকা ছবির মত কত বিচিত্র বস্তু!

উনি বললেন—যেন আমার মাঝে মাঝে কেমন মনে হয় আমিও ঐ জলের ভিতরের প্রাণী, আমি আছি গভীর জলের নীচে, ওপরে ঢেউ বইছে,—নীচে অন্ধকার, ওপরে সূর্যালোক।

—হয়ত তুমি জেলি মাছের পিসতুতো ভাই ছিলে কোনো জন্মে!

উনি বললেন—প্যালিয়োজোয়িক কালে আমি ছিলাম মৎস্য আর তুমি বেঙাচি, তখনও আমরা পাশাপাশি জলে ভেসেছি, মনে আমার ভারী আনন্দ কারণ তোমাকে তখনই ত' ভালোবেসেছি। আজ রাতে কবিতা পড়ে শোনাব।

নম্র হয়ে বললাম—ধন্যবাদ!

উনি হাসলেন। তারপর বললেন—তোমার কবিতার জ্ঞান বোধ হয় পদ্যপাঠ পর্যন্ত, আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে অন্ততঃ স্কুল থেকে কবিতা পড়ানো তুলে দিতাম। যে ভাবে কবিতার শ্রাদ্ধ সেখানে হয়, তারপর কাব্যলক্ষ্মীর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে।

আমি সমুদ্রতীরে শুয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকি, উনি দু'টি হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসে আছেন, চোখ দুটি দিগন্তের পানে নিবদ্ধ। ওঁর ঘন চুল আর মাথার গড়ন দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, দেহে শুধু সুষমা নয় আছে অপূর্ব শ্রী ও দৃঢ়তা।

তখনও পুরীর সিজন ঠিকমত সুরু হয় নি, তাই যাত্রীর ভিড় তেমন নেই। তবু একদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে দেখলাম, যে অংশটুকু আমাদের নিজস্ব ব'লে চিহ্নিত করা: সেইখানে আর একটি দম্পতি বেড়াতে এসেছেন। পুরুষটির দেহ যেন গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া, তেমনই দীপ্ত তাঁর ভংগী। মহিলাটিও চমৎকার—মাথায়

এক রাশ চুল, স্কুলের মেয়ের মত ছুপাশে বিনুনী, শাড়িটাও সেই ঢঙে পরা— স্বামীরই কোনো কথায় হয়ত মেয়েটি হাসছে, আমি দূর থেকে বসে ভাবতে লাগ্‌লাম—কি সুন্দর ছবিই না এঁরা দুজনে সৃষ্টি করেছেন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য, ও পরিতৃপ্তি সব কিছুরই একত্র সমাবেশ।

আর একটু লক্ষ্য ক'রে দেখি পাশেই এক বেতের চুপড়িতে তোয়ালে ঢাকা ঘুমন্ত শিশু শুয়ে রয়েছে। পরে আমাদের বাড়ির মালিটার কাছে শুনেছিলাম ওঁরা মুসলমান পরিবার, চক্রতীর্থে থাকেন, ছেলেটি মাত্র মাসখানেক হয়েছে।

আরো ছুবার ওঁদের দেখেছিলাম, একবার দেখি শিশুর মত ছু'জনে হাত ধরাধরি করে ছুটে চলেছেন সমুদ্রের তীর ধরে, ওঁদের খালি পায়ের চাপে বালি উড়ছে। আর একবার শুনেছিলাম মেয়েটি কি একটা গান শুনিয়ে ছেলেটিকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

সেই সপ্তাহের আর সব কিছুর সংগে এইটুকু আমার এখনও মনে আছে— মেয়েটির মধুর কণ্ঠ, তার স্বামীর অপরূপ স্বাস্থ্য ও দীপ্ত ভংগী, আর সেই সুকুমার শিশুটি। কোনোদিন ওঁদের সংগে কোনো কথা হয় নি, একবার শুধু মুখোমুখি হওয়ায় মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল মাত্র,—তবু অন্ততঃ সেই ক'দিন আমরা একই আনন্দ, একই সমুদ্রতীর উপভোগ করেছিলাম,—সমুদ্রের সীমানাহীন নীলে আমাদের মত ওরাও আত্মহারা হয়েছিল, আর আমাদের ছু'জনের মত ওদেরও অন্তরে ছিল প্রেম।

কতবার ওঁদের কথা মনে হয়েছে, কতবার ওঁদের কথা ভেবেছি, কোথায় ওঁরা থাকেন, এখনও কি মেয়েটি সেই ভাবে স্বামীর মুখের পানে তাকিয়ে হাসে, স্বামীটির আকৃতি কি এখনও সেই রকম মনোরম, সম্রাটের মতো বিজয়ীর দীপ্ত ভংগী তাঁর দেহে? আর পুরীর সমুদ্রতীরে শুয়ে থাকা সেই ছোট্ট শিশুটি? ছেলেটি এতদিনে নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়েছে। কি সে শিখ্‌ছে কে জানে? ঘৃণা, ভালোবাসা, ভয় সবই তার মনে এতদিনে ফুটে উঠেছে হয়ত।

উনি একদিন বললেন—হয়ত তুমিও প্রবীর চক্রবর্তীর নাম শুনে থাক্‌বে ?

আমি বললাম—হয়ত আমিও শুনেছি, কিন্তু ফিল্‌ম না রাজনীতি ?

হতাশ হয়ে ঠাণ্ডা গলায় উনি বললেন—প্রবীর এ যুগের একজন বড় আর্টিষ্ট, নতুন ধরণের ছবি এঁকে ওর বিশেষ সুনাম হয়েছে।

আমার মনে পড়ল, একদিন সকালে মা যখন সংবাদপত্রে তাঁর বান্ধবীর ফটো কুৎসিৎ ব'লে আমাকে দেখিয়েছিলেন তখন তার পাশেই পড়েছিলাম প্রবীর চক্রবর্তী সম্পর্কে একটি সচিত্র প্রবন্ধ।

উনি বললেন—কিন্তু তোমার মনে আছে ত' আমরা আর গাড়ি চড়বো না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। প্রবীব থাকে সেই ইস্ট পয়েণ্টে, এখান থেকে প্রায় চার পাঁচ মাইল, তোমার ওই শুভ্র চরণকমল কি অতদূর যেতে পারবে—?

—যেতে হয়ত পারবে, কিন্তু যাতায়াতে আটমাইল,—।

—আট কিংবা দশ, নির্ভর করে তোমার শক্তির ওপর।

—অগত্যা, রিক্‌স।

দশ

আলো, আরো আলো

প্রবীর চক্রবর্তী মহেশতলার চৌধুরী পরিবারের একজন বন্ধু, সেখানেও নাকি তাঁর বাড়ি আছে, সাধারণতঃ গরমের সময় পুরীতেই কাটান, জয়ন্তর সংগেও ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের এবং কাছাকাছি থাকলে দেখাশোনাও হয়।

পুরীতে সেই আমাদের শেষ দিন, পরদিনই আমরা কলকাতার পথে ফিরব, সোমবার থেকে ওঁকে সংবাদপত্র অফিসে গিয়ে হাজির হ'তে হবে। তবু ত' ব্যাঙ্কের কেরাণীর চাইতে অনেক ভালো। এই চিন্তাটাই এক খণ্ড মেঘের মত মনটাকে ক্ষণকাল আচ্ছন্ন ক'রে রাখল।

আমরা চলেছি চার পাঁচ মাইল দূরে ইস্ট পয়েন্টের পথে—

শুনলাম যাঁর মাথায় শুকনো বড বড় চুল, দুটি ডাগর চোখ, মাথাটি প্রকাণ্ড, দেহটি ক্ষীণ, আর মুখে চেরী-কাঠের একটা পাইপ—তিনিই প্রবীর চক্রবর্তী।

বাড়ির নাম 'নীড়'—এমনই পত্রপুষ্পে ঘেরা যে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই এর ভিতর বাড়ি আছে, আর সেখানে কেউ থাকে। চমৎকার পরিবেশ। একেবারে সমুদ্রের গা থেকে উঠেছে।

আমরা হঠাৎ জায়গাটিতে এসে পড়লাম, রিক্সটি থামিয়ে উনি নেমে পড়লেন, বললেন—একদিন আমরাও একটা এমনি ঘর বেছে নেব।

ওঁর সংগে প্রথম পরিচয়ের পর যে বাসা দেখেছিলাম তার কথা মনে পড়ল।

আমাদের সেই পার্কসার্কাস অঞ্চলের ফ্লাটটির কথা। আর সেই সংগে মনে পড়্‌ল আমাদের অতি-আধুনিক ঢঙের বাড়ি, তার ততোধিক আধুনিক সাজ-সজ্জা—আর আমার মা।

এমনই চমৎকার এখানকার দৃশ্য যে, মনে হয় যেন রেলওয়ে প্রচার-বিভাগের মুদ্রণ পারিপাট্যে অতুলনীয় কোনো প্রচার-পুস্তিকার ছবি দেখছি।

সূর্যালোকে উদ্ভাসিত পত্রপুঞ্জে ঘেরা সেই মনোরম কুটীরটির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। একটা ঘর থেকে ধোঁয়া উঠ্‌ছে, আর ছবির বই-এ দেখা বাগানেব মত একটি সুসজ্জিত বাগানে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, দূর থেকে তার অস্পষ্ট আভাস দেখা গেল।

এই পরিবেশে উনি যদি থাকতেন তাহ'লে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ সাহিত্যকর্ম করতে পারতেন। এই সমুদ্রতীর,—এই ছায়াঘেরা কুঞ্জ, এই শান্তির নিরালা নীড় যে-কোনো শিল্পকর্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

কিন্তু তা সম্ভব নয়, জীবন ওঁর কাছে এসেছে অন্যরূপ নিয়ে। তাই তার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু কেন? কেন?

শুধু বললাম—সত্যি চমৎকার!

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে উনি একটু হাসলেন, তারপর আমরা ভিতরে এগিয়ে চললাম।

একজন চাকর এগিয়ে এসে বল্‌ল—এখন দেখা হ'তে পারে, না হ'তেও পারে, বাবু এখন কাজ করছেন।

কথাটা একটু অবজ্ঞাভরেই যেন বল্‌ল।

বাড়ির ভিতরটাও বাইরের মতই মনোহর ও মনোরম। সবকিছু পরিপাটি ভংগীতে নিখুঁত ক'রে সাজানো।

উনি বললেন—চারমহলা বাড়ি, একটায় স্টুডিয়ো, একটায় শোওয়া, একটায়

চিন্তা করা, একটায় আড্ডা দেওয়া, সবগুলিই এমনই সাজানো। কেউ ওকে এখানে এসে বিরক্ত করতে পারে না। যখন যা খুসী আঁকে, কখনো স্কেচ্ করে, কখনও আবার পাথর কেটে মূর্তি গড়ে। কাজের জন্য চাই নিরুপদ্রব শান্তি।

এই সর্বপ্রথম আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতংকিত হলাম। জীবনটার সবটাই ত' আর ফুলের গন্ধ আর পাখির গান নয়, দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, আনন্দ আছে আবার বেদনা আছে, হাসির সঙ্গে কান্নাও মেশানো।

এখন আমরা বিবাহিত, আমাদের জন্য চাই উপযুক্ত অর্থ, হয়ত সন্তানও আস্‌তে পারে দু' একটি, তাদের অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা, কি যে তার খরচ কে জানে! ওঁর ত' বন্ধন বেড়ে চলেছে, মুক্তি কোথায়? ব্যাঙ্ক থেকে যদি কোনোমতে বেরোতে পারেন তাহ'লে সংবাদপত্র, সেও সামান্য মাইনের চাকরী, কি ক'রে উনি বই লিখবেন, লিখবেন মনের মত কবিতা? ওঁর জীবনে নিরুপদ্রব শান্তি কোথায়?

তারপর হয়ত মনে জাগবে ঘৃণা, সব কিছু বন্ধনের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা, আমিও ত' একটা বন্ধন। হয়ত একদিন এই প্রেমের অপমৃত্যু ঘট্‌বে,—তখন— ?

আমার ঐ গোপন ক্রন্দন যেন ওঁর চোখে ধরা পড়ে গেল, আমার কাঁধে হাত রেখে অসীম প্রীতিভরে উনি ব'লে উঠলেন—ভয় নেই, আমাদেরও জীবন এমনই মধুর হবে। কেন, তা প্রশ্ন কোরো না, তবে আমি জানি,—ভালো কিছু একটা হবেই। আমি প্রবীর চক্রবর্তী নই,—আমি আমিই। আমার জীবনের যা সংগ্রাম, যা কিছু ক্লেশ, যা আমার অভিজ্ঞতা, সে আমারই। তেমনই তোমারও। কিন্তু সেই ত' ভালো। এই যে ভালো তা আমার অজানা নেই। লক্ষ্য করেছ কি, সব সময়ই এমন সব ঘটনা ঘট্‌ছে, এমন সুযোগ-সুবিধা মিলছে যা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর? এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। একটি জিনিষ শুধু জানি আমাদের ভয়ের কিছু নেই, মনে কোনো শংকা বা সংশয় রেখো না। আমরা কে, আমরা কি এবং

আমরা কোথায় এ প্রশ্নের প্রশ্রয় দিয়ো না। শুধু লক্ষ্য রাখবে কালের স্রোতে যেন পিছিয়ে না পড়ি। আমরা—'

আমার চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল, বললাম—তোমার এই কথায় স্বস্তি পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কারো মনে কি আর সেই সোনালি স্বপন আছে— ?

দুষ্টামিভরা হাসি হেসে উনি ব'লে উঠ্‌লেন—কেন তুমি! এতদিন জেনে এসেছ রূপার ঝিনুক মুখে নিয়ে জন্মালে পৃথিবীটা কেমন সহজ মনে হয়। প্রাচুর্যের মধ্যে পেয়েছ শান্তি, এখন তোমাকে অনটনের মাঝে আনন্দে থাকতে হ'বে। বিত্তহীন হয়ে রিক্ততার দীক্ষাই এখন তোমার জীবনে প্রধান হোক।

আমিও সহাস্যে বললাম—সব বিষয়েই তোমার উত্তর জিভের গোড়ায় জুগিয়ে আছে, বক্তৃতা-বিশারদ হয়ে উঠ্‌ছ দিন দিন। রিক্ততার দীক্ষা নিতে কি এখনও কিছু বাকী আছে ?

উনি স্নেহভরে আমার পিঠে মৃদু আঘাত ক'রে বললেন—জানি, শুধু জানি না কেন তোমাকে ভালবাসি। এ প্রশ্নের জবাব আমার নেই। চিরদিন তা আমার কাছে রহস্য হয়ে রইল।

দরজার গোড়ায় চটিজুতার চড়া আওয়াজ শোনা গেল, মুখ তুলে সামনেই দেখি পাজামা-পরা পাইপ-মুখে তরুণ শিল্পী দাঁড়িয়ে রয়েছেন—বুঝলাম ইনিই প্রবীর চক্রবর্তী।

তিনি সানন্দে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—আরে জয়ন্ত যে! ফাগুনি যখন বলল তখন আমার বিশ্বাস হয়নি যে তুই এসেছিস্, তারপর, এখানে কি ? তোমার লাল ঝাণ্ডা না তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ?'

পোষাক দেখেই অনুমান করেছিলাম উনি ছবির কাজেই ব্যস্ত ছিলেন। উনি বললেন—প্রবীর ইনি আমার স্ত্রী, মিনতি,—আর বুঝতেই ত' পারছ—শিল্পী প্রবীর চক্রবর্তী!

প্রবীর ব'লে উঠ্‌লেন—স্ত্রী! বলিস কি রে—স্ত্রী?

সেই নীলচোখের মর্মভেদী দৃষ্টির দংশনে আমি যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম।

—ইয়ে আল্লা—, জয়ন্ত তোর বউ ত' বেশ সুন্দরী দেখ্‌ছি। তা এঁকে কি তোদের গান্ধী আশ্রম থেকে পাকড়াও করেছিস্ নাকি?

নিজের মনেই ভদ্রলোক কথা ব'লে চলেছেন।

—বউ! চমৎকার বউ! এইখানে দাঁড়া দেখি দুজনে, একেবারে রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাক্, একেবারে কমপ্লিট্ এফেকট্‌টা দেখি। আচ্ছা বৌদি, আপনি কি ব'লে এই লোফারটাকে বিয়ে করলেন? ও ত' আবার কালই জেলে যাবে, সেখানেই ত' ওর পাকা শ্বশুরবাড়ি। আমাকেই আপনার বিয়ে করা উচিত ছিল, তাহ'লে এখনই রোদে দাঁড় করিয়ে রেখে হাজারটা ছবি আঁকতুম্!

উনি বললেন—আর ফাগুনি এসে দিনে দু'বার জল খাইয়ে যেত। মিনতি ও, পাগল, ওর কথায় কিছু মনে কোরো না।

প্রবীর চমকে উঠ্‌লেন—তুই থাম, কালকের ছোক্‌রা, চিরকাল স্বদেশী ক'রে এলি, রূপ বা সৌন্দর্য সম্পর্কে তোর কি আইডিয়া আছে? খদ্দর বা হরিজন আন্দোলনের বিষয় তুই কিছু বললে নিশ্চয়ই আমি মাথা পেতে শুন্‌ব। বুঝলেন বৌদি, একেবারে সেই বিউটি এ্যাণ্ড দি বিস্ট। আজকাল পদ্যটদ্য লিখছিস্? ফাগুনি শীগ্‌গীর কফি তৈরী ক'রে নিয়ে আয়, আর শোন ঠাকুরকে বল, এঁরা আজ এখানেই খাবেন। আসল কথা এইখানেই আজ বউভাত হবে। ফাগুনি, ফাগুনি, ফাস্টক্লাস রান্না হওয়া চাই—

ফাগুনিও তেমনি চাকর, সে বলল—বাবু, এটা কি কলকাতা?—বাড়িতে আছে শুধু আলু আর ডিম। এতে কি বউভাত হবে?

—তোকে সে সব ভাবতে হবে না, ঠাকুরকে বল, সে ঠিক সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

ইস্ট পয়েণ্টের সেই উজ্জ্বল প্রভাত আমাদের কাছে চিরদিন উজ্জ্বল হয়েই থাকবে,

তার কারণ প্রবীর চক্রবর্তীর এই আনন্দ-উজ্জ্বল শিশুসুলভ চপলতা আমার চোখে একটু অপরূপ ঠেকেছিল, আর দ্বিতীয় কারণ তিনি সেদিন এমন একটি কথা বলেছিলেন যার অর্থ তখন ঠিকমত না বুঝলেও আজ বুঝি।

আমরা কফি ও বিস্কুট খেলাম তারপর সেই অদ্ভুত বউভাতের খানা—। ঠাকুর শুধু ডিম নয়, তার সঙ্গে চিংড়ি মাছও সংগ্রহ করেছিল। দুধ দিয়ে একটু পায়েস তৈরী করেছিল, আর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ওদের আন্তরিকতা।

আজ এতদিন পরে ব'সে সেই অতীতের কথা স্মৃতির খাতা থেকে লিখে চলেছি, কাচের সার্সীতে প্রচণ্ড বৃষ্টির অবিরাম আঘাত শুনতে পাচ্ছি, দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটি হাওয়ায় এমনই দোল খাচ্ছে, মনে হয় যেন ভেঙে পড়ল বুঝি। বাড়ির চার পাশে পাগল হাওয়ার উদ্দামতা। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি কেবল মনে পড়ছে—

"পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে,
পাগল আমার মন কেঁদে মরে।"

আকাশ মেঘে ঢাকা, সামনের নীল মাঠ সবুজ কার্পেটের মতো পড়ে আছে, আকাশে ধূসর রঙ, তবু আমার মনে ভাসছে সেদিনের সেই সোনালি রোদ-মাখানো সমুদ্র-তীর, মনে পড়ছে প্রবীর চক্রবর্তীর স্টুডিয়ো আর তার কাচের জানালা, প্রকাণ্ড ক্যানভাস আর অসংখ্য ছবি। আমরা আসার পর তাঁর ছবি-আঁকার শাদা আচকানটা খুলে ফেলেছিলেন, মেঝের একপাশে সেটা সেই ভাবেই পড়ে আছে। সিগারেট, পাইপের তামাক, পেণ্টের গন্ধ, তার সংগে মিশেছে, সমুদ্র থেকে ভেসে আসা ওজোনের গন্ধ। উনি একটা অর্ধ-সমাপ্ত ছবির সামনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে, ছবিটা বোধ হয় 'সমুদ্রে সূর্যোদয়', সূর্যদেব উঠছেন আর কয়েকটি সিন্ধু-শকুন উড়ে চলেছে, ঢেউয়ের সংগে যেন পাল্লা দিয়ে চলতে চায়।

প্রবীর বাবু কিন্তু ওঁর পাশে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে। বললেন—বড় ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে ভাই,—কেমন যেন প্রাণ নেই, আমি চাই আলো, সেই রঙও আছে,

টিউবে রঙের অভাব নেই, কিন্তু—' এই ব'লে তিনি তাঁর লম্বা হাত দিয়ে একটা ভংগী করলেন।

প্রবীরবাবু ব'লে চললেন—চাই আলো—গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু আলো। আলো, আলো, আলো। সমুদ্র, পাখি, তুমি, আমি—সবই শুধু সেই আলো। ঈশ্বর বলেছিলেন—Let there be light—তাই গন্ধে, বরণে, প্রাণে সর্বত্রই সেই জ্যোতির্ময় আলো। এই এক অপূর্ব রহস্য জয়ন্ত, বিশ্বাস করিস আব নাই করিস, আলোব আকর্ষণ বড় ভীষণ। তুমি একটি উদর আর পাকস্থলী বিশিষ্ট মানুষ নয় ভায়া, তুমি একটি সক্রিয় আলো। সাক্ষী সেই জার্মান কবি, শেষের দিন অন্তিম মুহূর্তে যিনি বলেছিলেন—আলো, আরো আলো।

মাথাব চুলে আঙুল চালিয়ে প্রবীব চক্রবর্তী আবার বললেন—আমি যদি ঘাসেব ডগায় ফুটে ওঠা এই আলো এতটুকু আঁকতে পারতাম, তা'হলে আমি স্বচ্ছন্দে মবতে পারতাম, কিন্তু সে রঙ আনতে পাবছি কই? পারছি না, পারছি না,—কাবণ জীবনই আলো, এমন কি দা ভিঞ্চিও জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে পাবেননি ভাই—'

উনি বোধ হয় ভুলেই গিছলেন—আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি, আত্মভোলার মতো বললেন—যেথানে আলো আছে সেখানে আব কোনো অন্ধকার নেই, তাইত বৈদিক ঋষিরা অনির্বচনীয় জ্যোতির্ময় পুরুষেব ধ্যান ক'রে গেছেন। আনন্দ-লোক ত' আলোকেরই লোক।

প্রবীর চক্রবর্তী বললেন—আর আমাদের চোখ এমনই হয়ে আছে যেখানে আছে অনন্ত সৌন্দর্য তার মধ্যে শুধু ক্লেদাক্ত বাস্তবের রুক্ষ রূপ দেখছি।

ওঁরা দুজনে যেন বৈদিক মন্ত্র উচ্চাবণ ক'রে চলেছেন—এই ভাবেই চলেছে ওঁদেব আলোচনা।

প্রবীর বাবু বললেন—যদি আমাদেব চোখকে তেমন ক'রে তৈবী করতে

পারি তাহ'লে এই আলোকের ঝরণা ধারা দেখা যাবে, যা দেখেছেন একালের ঋষি রবীন্দ্রনাথ। তোর মনে আছে আমাদের স্কটিশ চার্চের সেই ফাদার ব্রাউনকে। কথায় কথায় তিনি বলতেন—"Thy Kingdom be seen on earth as it is by those who have received clearer sight in heaven—"

ওঁরা দুজনে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছেন সেই অর্ধ-সমাপ্ত ছবির দিকে তাকিয়ে, আর কেন জানিনা আমার মন চলে গেল অনেক দূরে—আমাদের বিয়ের আগের দিন আমার মনে এমনই একটা আতংক জেগেছিল। কারণহীন শংকা। মাথার ওপর দিয়ে যেন কালোছায়া উড়ে গেল।

চার বছর পরে আর একটি শারদ প্রভাতে এই মুহূর্তের কথা মনে পড়ল। শুনলাম প্রবীর চক্রবর্তী বলছেন—যাদের দিব্য দৃষ্টি আছে তারাই তোমার মাটির জগতেও তোমার স্বর্গরাজ্য দেখতে পায়।

আর একটি কথা মনে আছে, উনি প্রবীরের মালি দামোদরের সংগে বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। প্রবীর চক্রবর্তী আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ব'লে উঠলেন—দেখবেন মিনতি দেবী, জয়ন্ত একদিন কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে, শুধু কবি নয়, বড় কবি।

কি জানি কথাটার মধ্যে কি ছিল, ওঁর বড়ত্বে আমার অন্তরে হয়ত ঈর্ষা ছিল,— কিংবা মনে মনে ভয় ছিল বড় হ'লে হয়ত আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবেন, তার চেয়ে এই ভালো, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ ভাগাভাগি ক'রেই কাটিয়ে দেব। মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় উত্তর বেরিয়ে এল—না। জানেন ত' উনি এখনও ব্যাঙ্কের কেরাণী।

প্রবীর ব'লে উঠলেন—সর্বশ্রেষ্ঠ কবি একজন ছুতার ছিলেন।

আমি বললাম—ওটা মানুষ সুবিধার্থে ব্যবহার করে, ছোট কাজকে মহৎ

ক'রে দেখানোর উদ্দেশ্যে এই ভাবে তাকে একটা পবিত্র পোষাক দেয়।—তারপর নিষ্প্রাণ গলায় বললাম—ও সব কবিতা-টবিতা আমার সয় না।

অনুভব করলাম প্রবীর চক্রবর্তীর থাবার মত হাত আমার পিঠে পড়ল— আবৃত্তির সুরে তিনি বললেন—

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা—'

জীবনে আত্মপ্রবঞ্চনার সুযোগ নেই বৌদি, আপনার মুখের পানে তাকিয়ে একটু হেসে জীবন কোনদিন পথের বাঁকে থম্‌কে দাঁড়াবে না, সে অপরিচিতের মত নিজের খুসীমত পথ ধ'রেই আপনাকে উপেক্ষা ক'রে চলে যাবে।

আমরা আবার স্বর্গদ্বারে ফিরে এলাম।

এই আমাদের শেষ দিন—আহারান্তে তাই একবার শেষবারের মত সমুদ্র-তীরে বালির ওপর বেড়াতে বেরোলাম। প্রাইমাস স্টোভ ধরিয়ে দিয়েছিলেন উনি,—এমনই মন দিয়ে সে কার্য করেছিলেন যেন তার ওপরই জীবন মরণ নির্ভর করছে।

বাতাস স্নিগ্ধ,—ঢেউএর পর ঢেউ আস্‌ছে, তটভূমি প্লাবিত ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ছে আবার চলে যাচ্ছে—সমুদ্র নেয়না কিছু, সবই আবার ঢেউএর সংগে ফিরিয়ে দেয়, সেই সংগে ঝিনুক ও মুক্তাও থাকে। দূরে নুলিয়ারা মাছ ধরছে, ওর মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী আপ্‌পানাও আছে আর আছে তার স্ত্রী জানকী আম্মা। আর আধ ঘণ্টা পরেই আপ্‌পানা পাতায় জড়ানো চুরুট মুখে দিয়ে ভিজা লেংটি পরে বাড়ি ফিরে এসে হৈ চৈ সুরু করবে। জানকী পাতা-নাতা জেলে আগুন ধরাবে, সুরু হবে দিনের রান্না। কাছাকাছি বাড়িতে আলো জলে উঠবে, সমুদ্র এমনই আছাড় খেয়ে পড়বে—কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকবে না।

আজকের এই রাত আর আগামী কাল দুইই ওদের কাছে সমান—কোনো

নতুন উত্তেজনা—নতুন আনন্দ—আগামী দিন বহন ক'রে আনবে না। আপ্‌পানা ঠিক এই সুরেই জানকীকে ডাকবে আর জানকীও এমনি ক'রে কলাইওঠা পাত্রে ওর জন্য চা গরম ক'রে নিয়ে এসে দাঁড়াবে।

আগামী কাল! কত আগামী কাল ওদের কাছে এই ভাবেই কেটে যাবে, শুধু আমরা চলে যাব। জানকীরাও একদিন ভুলে যাবে যে, আমরা এখানে এসেছিলাম।

আমি বলে উঠলাম—ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছে ক'রে এইখানেই চির-দিন বসে থাকি।

উনি আমার হাতটা সজোরে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন: জানোত'—'He who binds to himself a joy, does the winged life destroy—' এই দিনটি কি এমনই মধুর ক'রে ধরে রাখতে পারবো? এ ভাবে আর একে রাখা যাবে না—'

আমি বলেছিলাম—পারবো, আমরা পারবো। ও সব মিথ্যা কথা।

কিন্তু আমার কানেও কথাটার অন্তর্নিহিত মিথ্যা সুর বেসুরো হয়ে বাজলো।

উনি বললেন—শুনতে খারাপ বটে কিন্তু তবু একে ছেড়ে দিতে হবে, শুধু এই দিনটুকু নয়, অনেক কিছু ছাড়তে হবে। যে হারায় সে ই আবার পায়, জানো ত'। বুঝ্‌ছো না মনটাকে যদি এই আনন্দেই আটকে রাখি তা'হলে আরো আনন্দের সন্ধান পাবো না, আমাদের আঙুলে আর কিছুই ধরা পড়বে না।

ভাবলাম এই জন্যই কি মহত্তর প্রেমও একদিন ঘোলো এবং প্রাণহীন হয়ে ওঠে? তাই কি যে চোখে মুগ্ধ আবেশ, তাতে জাগে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা? এই তত্ত্বই কি জেনেছেন রমানাথ বাবু আর শীলা?

শীলা একদিন বলেছিল—যে যেতে চায় তাকে ধ'রে রাখা যায় না।

আমার অন্তরে কে যেন বিদ্রোহ জানালো—কিন্তু জানতাম তার কোনো মূল্য নেই।

দিনের শেষ হ'ল, রাতের অন্ধকার যেন ঘন হয়ে জম্‌লো, আমরা নীরবে সেই সমুদ্রতীরে ব'সে সমুদ্রের কান্না শুনতে লাগলাম।

কি জানি কেন আমার মনেও কেমন অশান্তির ঢেউ এসে লেগেছে। অন্তরের চাপা কান্না প্রকাশের পথ খুঁজে পায় না।

এগার

কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ি

কলকাতার কথা মনে হ'লেই আমাদের সেই সার্কাস অঞ্চলের ফ্ল্যাটটির কথা মনে পড়ে, সেই সঙ্গে বাড়ির মালিক উষাঙ্গিনী দেবীর কথাও মনে হয়। আমরা তাঁকে উষাদি বলতাম,—কলতলা জুড়ে ব'সে সারা সকাল ধ'রে কড়া আর চাটু পরিষ্কার ক'রে স্বহস্তে মাজতেন আর আপন মনে কত কথাই না বলতেন।

সদর দরজাটি ভার্নিস করা, তার ওপর ছিল লাল-নীল কাচ, সকালের দিকে তার ভিতর দিয়ে বিচিত্র বর্ণের আলো এসে পড়ত। কয়েকটা ফুলের গাছও টবে বসান ছিল, বারো মাস চন্দ্রমল্লিকার গাছ টবে থাকত, কখন বড় গাছ, কখনও চারা, ফুল কিন্তু হ'তনা। ফুল হ'ত গাঁদা গাছে, আর দু'একটি বেলফুল গরম কালে ফুটত। উষাদি স্নান সেরে সেই ফুল তুলে শিব পুজোয় বসতেন।

আর ছিল বেরাল, প্রায় দু'তিনটি, সারাদিন এদিক ওদিক ক'রে বেড়াত, পাশের বাড়ির ভদ্রলোকটির একটি বিলাতী এয়ারডেল কুকুর ছিল, যত্নের অভাবে তার আকৃতি প্রায় দেশী কুকুরের মতই হয়ে এসেছিল, তার প্রকৃতি ছিল ঠাণ্ডা। সারাদিন রোদে চুপ ক'রে শুয়ে থাকত, ফেরিওলা বা ভিক্ষুক দেখ্‌লে চেঁচিয়ে উঠ্‌ত, আমরাও জান্‌তে পারতাম কেউ এসেছে।

প্রতিবেশীদের সবায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল। কয়েকজন আবার নম্বর হিসাবে পরিচিত ছিলেন যেমন সতের নম্বরের দিদি, পাঁচ নম্বরের বৌদি!

কিন্তু সব চেয়ে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বারোনম্বরের বাড়ি, ঠিক আমাদের সামনের বাড়ি। এমনই তার চতুর্দিকে পরদা ঘেরা যে, ভিতরের কোনো কিছু চোখে পড়ত না। কাউকে দেখতেও পেতাম না, আর অত্যন্ত গ্রীষ্মের দিনেও জানলা বন্ধ থাক্‌ত। কদাচিৎ দেখতাম গয়লা দুধ দিয়ে বেরিয়ে আসছে বা ধোপা বাড়ির ভিতর ঢুকছে। সামনের ছোট্ট বাগানটি নানাবিধ আগাছায় পরিপূর্ণ।

একদিন দেখলাম দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক কড়া নাড়ছেন, কে এসে দোর খুলে দেয় দেখার জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম, অনেক পরে দরজাটা একটু ফাঁক হ'ল, ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন, অন্তরালবর্তিনীর একখানি ম্লান শাড়ি ভিন্ন আর কিছু দেখলাম না। নিঃশব্দে ভদ্রলোকটি যেন এক রহস্যপুরীর ভিতরে প্রবেশ করলেন।

এর কয়েক সপ্তাহ পরে ওঁর কাছে শুনলাম এ বাড়িতে নাকি একজন অধ্যাপক থাকেন, আর তাঁর মূক ও বধির মেয়ে। লোকটি নাকি অত্যন্ত ধনী আর তেমনই কৃপণ।

ওদের কথা প্রায়ই আমার মনে হ'ত, প্রৌঢ় কৃপণ আর নিঃশব্দচারিণী কন্যা—চিরদিন পর্দানশীন হয়েই নিঃশব্দে কাটিয়ে দিল। ঘরগুলি কেমন কে জানে, কি ভাবে মেয়েটির দিন কাটে, কে বাড়ির কাজ করে, কে রাঁধে,—নেহাৎই অকারণ কৌতূহল, তবু আমার এই সব কথা মনে হ'ত। আর ভাবতাম কি অপরূপ ঘটনা-বিপর্যয়ে ওদের এই পরিণতি ঘটেছে কে জানে। যদি এমন হয় মেয়েটির একদিন দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ার বাসনা মনে জাগে; সে যদি বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে, তা'হলে—?

কিন্তু আমার এ প্রশ্নের জবাব পাইনি।

এইখানকার ফ্ল্যাট বাড়িতেই আমি পুরোপুরি রাঁধতে শিখলাম।

এ এক অতি বিশ্রী শিক্ষা, আর এমন দিন গেছে যখন আশাহীন হয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুধু কেঁদেছি।

বার বার বাড়ির কথা মনে পড়েছে,—মনে পড়েছে সেখানকার নানাবিধ রসনা-তৃপ্তিকর সুখাদ্যের কথা, কতদিন বিরক্ত হয়েছি, কত মূল্যবান খাবার নষ্ট করেছি। 'পাকপ্রণালী' দেখে রাঁধতে গিয়ে কতদিন সব ভণ্ডুল ক'রে একটা অখাদ্য সৃষ্টি করেছি,—মাঝে মাঝে মনে হয়েছে একটা সুখাদ্য তৈরী করাই যেন আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম। এমন কি তার জন্য ভগবানকেও মনে মনে ডেকেছি।

ওঁর কাছে কেঁদে বলেছি—কি করি বলো ত', বই খুলে ব'সে রাঁধি অথচ এমন ছাই ভস্ম হয়ে যায়। একদিনও তোমাকে তৃপ্তি ক'রে খাওয়াতে পারলাম না।

উনি শুধু হেসে বলতেন—সবাই যদি রন্ধনে দ্রৌপদী হবে তা'হলে স্বর্গ থেকে তাঁর আত্মা যে অতিশয় কষ্ট পাবে। দু'চার দিনের মধ্যেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমরা তিন মাস হ'ল পুরী থেকে ফিরে এসেছি। ইস্ট পয়েণ্ট আর প্রবীর চক্রবর্তীর বাড়ি সবই এখন স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় ওঁর নতুন কবিতার বই 'কালবৈশাখী' প্রকাশিত হ'ল। আটচল্লিশ পাতার বই। ওপরের মলাটটি চমৎকার, ঝড়ের একটা আভাষ দেওয়া আছে। প্রকাশককে নাকি অনেক অনুনয় ক'রে, ভবিষ্যতে উপন্যাস লিখে দেবার কড়ারে এই কাব্য-গ্রন্থটি তিনি প্রকাশ করেছেন। কবিতার বই বাঙালী পাঠক কেনে না। যদিও কেনে তা'হলে রবীন্দ্রনাথের নীচে নামতে চায় না। আধুনিক কবিতা অধিকাংশ পাঠক বোঝে না এবং কবিতার আঙ্গিক ও প্রকৃতি নিয়ে যে পরীক্ষা চলেছে সে সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। তাই বই প্রকাশিত হ'লে বন্ধু-বান্ধবই পড়ে থাকেন, দু'একজন রসিক ব্যক্তি কদাচিৎ কিনে থাকেন।

প্রকাশক ভালো কাগজে মুড়ে পাঁচখানি বই পাঠিয়েছে।

ওঁর যে কি আনন্দ! কবিতাগুলিতে নাকি নতুন সুর ও নতুন দিনের কথা আছে। তখনই প্যাকেট খুলে আমরা বই দেখতে ব'সে গেলাম, চমৎকার ছাপা

আর বাঁধাই, প্রকাশক সেদিক থেকে কার্পণ্য করেন নি। সময়ের কথা ভুলে গিয়ে উনি একটির পর একটি কবিতা প'ড়ে শোনালেন, কিছু বুঝলাম কিছু বা বুঝলাম না। আমার চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসছিল, বারবার মনে মনে ধিক্কার জাগলো, কেন আমি ওঁর উপযুক্ত হইনি।

সেদিন সকালে আর রান্না করা গেল না। উনি না খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন, সংবাদপত্র নতুন হলেও ভীষণ কড়াকড়ি, মাড়োয়ারী মালিকের সংবাদপত্র অফিস আর সওদাগরী অফিসে কোনো প্রভেদ রাখে নি। সহসা থানার ঘড়িটা বেজে উঠ্‌তেই উনি সচকিত হয়ে উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটা গায়ে ঝুলিয়ে বললেন—বড় দেরী হয়ে গেল, চললাম, অফিসের ক্যান্টিনেই খাওয়াটা সেরে নেব। তুমি মনে কষ্ট কোরো না।'

এই বলে এক রকম লাফাতে লাফাতে চ'লে গেলেন।

সেই রাতে কিন্তু লক্ষ্য করলাম ওঁর মনে এতটুকু আনন্দ নাই।

উনি বললেন—দেখ মিনতি, এই দু' তিন বছর পরে একখানি বই প্রকাশিত হওয়ার কোনো অর্থ নেই। মাত্র দু'একটি বই, কি এর দাম?

ওঁর মুখ দেখে আমার অতিশয় কষ্ট হ'ল। আমি সান্ত্বনা দেওয়ার ভংগীতে বললাম—এই ত' সবে সুরু আরো কত বই হবে, দেখো তুমি।

উনি বললেন—সুরু নয়, এই শেষ, আর আমি কবিতা লিখব না। ঘুরে ফিরে কিছুতেই মনে শান্তি আনতে পারি না, একটা কম্‌প্লেকসে মন ভরে আছে, ছিলাম ব্যাঙ্ক কেরাণী, এখন না হয় সংবাদপত্রের স্টাফ রিপোর্টার। হিসাব ক'রে দেখলে দুটো একই কাজ, প্রকৃতিটা বিভিন্ন।

বললাম—ও সব কথা মনে ঠাঁই দাও কেন, তুমিই ত' বলছিলে সে দিন কে একজন বড়লোক পোলের তলায় বসে জুতা সেলাই করতেন, পরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তুমিও ত' এখন বই লিখেছ। নিশ্চয়ই একদিন এর আদর হবে।

তারা কি জানতে চাইবে তুমি ব্যাঙ্কের কেরাণী না খবরের কাগজের রিপোর্টার ? নিজের চোখে ধুলো দিচ্ছ তুমি।

উনি হাসলেন, কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ নেই।

বললেন—মন্দ নয়, এ একপ্রকার আত্ম-সম্মোহন। অস্ট্রিচের মত বালিতে মুখ লুকিয়ে রাখা। বেশ লোক আমরা। নয় ?

—না-না,—ও কথা বোলো না, ও আমার সয় না।

উনি দুটি হাত প্রসারিত করলেন, আমি ধরা দিলাম। আমি জানতাম একটা নিদারুণ হতাশায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন, যেন একটা অতিকায় স্টীম-রোলার পিষিয়ে-গুঁড়িয়ে সারা দেহ একেবারে প্রাণহীন ক'রে দিয়েছে।

উনি বললেন—আমি একটি পশু, না করতে পারছি দেশের কাজ, না সাহিত্য। চেষ্টা করছি এই মনোভংগী কাটিয়ে উঠ্‌তে, কিন্তু পারছি না।

বললাম—দেখ—তুমি ভুল করছ, যে কাজে আছ তাতে যদি শান্তি না পাও, যা তোমার মনে লাগে সেই কাজেই লেগে থাকো, তার জন্য সব কষ্টই আমার সইবে। খাঁচার ভেতর বন্দী থাকা ভালো নয়—

—ঠিক খাঁচা নয়, মাথাটা ঠিক ক'রে কাজ করতে পারলেই হ'ল, অন্ততঃ যা করছি মনে যদি তার সমর্থন থাকে তাহ'লেই শান্তি, তাহ'লেই পাব উৎসাহ আর প্রেরণা—আর তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি ?

আমার হাতটা সজোরে চেপে উনি বললেন—কি যে তা ঠিক জানি না, তবে কি জানো আমার চাইতেও খারাপ অবস্থা মানুষের আছে, আমার চাইতেও অনেক নোঙরা কাজ মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে করতে হয়, আমারও নিজেকে তাদের চেয়ে বিভিন্ন ভাবা উচিত নয়—

—তবু তুমি বিভিন্ন। তোমার কবি-মানস যদি আঘাত পায় তাহ'লে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজই করা উচিত নয়।

—কথাটা মন্দ বলোনি, কিন্তু আমার নিজেরই মনের নেই ঠিক, ক্লকের সেই কবিতা মনে আছে? 'Wanderers in the middle midst who doubt and sigh—' আর শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে না। তারপর একটু থেমে আবার বললেন—এ সবই আত্ম-বিশ্লেষণ! এই জিনিষটাই অথচ আমি ঘৃণা করি। মাঝে মাঝে ভাবি এমন একটা ভয়ংকর কিছু ঘটুক যার ফলে এই আত্মকেন্দ্রিকতা কাটিয়ে উঠতে পারি; যার ফলে সকল ভয় ও ভাবনা, সন্দেহ ও সংশয়ের মেঘ চিরদিনের মত কেটে যাবে।

আমি বললাম—একদিন তুমি বলেছিলে এতটুকু সন্দেহ ও সংশয় মনে না রেখে জীবনটাকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে হবে—

মাথা তুলে মৃদু হেসে উনি ব'লে উঠ্‌লেন—বদ্যি নিজের রোগ সারাও—বলেছ মন্দ নয়। আমরা যদি শুধু কথা না ব'লে স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারতাম। আমাদের এ যুগে শুধু কথা—কথা—আর কথা—

—তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বইও লেখে, যেমন এই আমার হাতের কাছে রয়েছে "কালবৈশাখী"।

উনি হাসলেন—বললেন, দেখ ঐ যে সামনের দোকানের বিশ্বেশ্বর আর লছমীয়া, ওদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ কোনো দিন? সারা দিন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে কিছু না কিছু করছে, স্বামী যখন ক্লান্ত হয় তখন লছমীয়া এসে দাঁড়ি-পাল্লা ধ'রে সওদা বেচে! সব জিনিসের দাম ওর জানা, কোন্ খরিদ্দারকে কি বলতে হবে তাও শিখে নিয়েছে। রাতে বিশ্বেশ্বর পড়বে 'তুলসীদাস' আর লছমীয়া করবে রান্না। তারপর ওইখানে একটা মাদুর পেতে পরমানন্দে শুয়ে পড়বে।—

—তুমি বিশ্বেশ্বর হ'লে তোমারও ভালো লাগ্‌ত, লছমীয়ার প্রেমে ও সেবায় দিনগুলি ভালোই কাট্‌ত।

উনি অট্টহাস্য ক'রে উঠ্‌লেন। বললেন—না আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়,

চলো একটু না হয় কিছুদূর বেড়িয়ে আসি। তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে নাও, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।

সেই সপ্তাহে উনি একটি চমৎকার কবিতা লিখলেন। বন্ধুরা প্রশংসা করল,— আর মাসিক পত্রে ছাপাও হল, কবিতাটির নাম 'মৃত্যু-উৎসব'। কেন জানি না কবিতাটা ভালো হ'লেও আমার মনটা কিন্তু কবিতা পড়ে খারাপ হয়েছিল। বিশেষ ক'রে শেষের দিকটি—

> সুরার সোনার পাত্র অকস্মাৎ হেরি যে মৃন্ময়,
> রাত্রির কলংক কালি মোর কাছে নহেক বিস্ময়।
> আমার তামসী প্রিয়া এলো আজ চঞ্চল চরণে,
> এলো নিশা উৎসবের, অমারাত্রে বরিব মরণে।
> মৃত্যু আজি স্বয়ম্বরা মোরে তাব বক্ষে নিল ধ'রে,
> প্রিয়ার নীলাভ আঁখি, মৃত্যুনীল আমার অধরে॥

এই কবিতাটির প্রশংসা হওয়ায় ওঁর উৎসাহ বেড়ে গেল, অনেককাল আগে কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছিলেন, একজন প্রকাশকের আগ্রহে এইবার একটি উপন্যাস সুরু করলেন। উষাদি'র একটি খালিঘর প'ড়ে ছিল, দু'টাকা বেশী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই ঘরটা আমরা পেয়ে গেলাম। সেই ঘরটিই ওঁর লেখার ঘর হয়েছিল, দক্ষিণ দিকে একটি ছোট জানলা ছিল, তাই আলো-বাতাসের অভাব ছিল না।

উনি যখন লিখতেন তখন বিছানায় একা শুয়ে জেগে থাকার মত বিরক্তিকর আর কিছু নেই। এত কাছে থেকেও তবু কতদূরে, তাই সেলাই-এর কাজ নিয়ে বসতাম আর ভাবতাম এই ছোট্ট ঘরটিতে বসে থাকলেও মন ওঁর কত দূর দূরান্তরে চলে গেছে। কতদিন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, অনেক রাতে উনি যখন শুতে আসতেন তখন ওঁর অবসাদভরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে দেখতাম, ক্লান্ত বটে তবু যেন পরম প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ।

এই সপ্তাহেই মাকে দেখলাম।

বারো

কায়াকল্পের ভেল্‌কী

বাড়ি ছাড়লেও দাসী সরোজিনী আমার সঙ্গে একটা যোগাযোগ রেখেছিল। মাঝে মাঝে এক আধটা পোস্টকার্ড অসমান হস্তাক্ষরে লিখত, আবার একবার এই ফ্লাটে চলেও এসেছিল আমার অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করার উদ্দেশ্যে। আমাকে ছেড়ে অবধি তার মন ভালো নেই। এবার তার ছেলের বউটি অসুস্থ তাই শাঁখারিটোলায় ছেলের কাছে এসে আছে ক'দিন। সেইখানেই যেতে বলেছে।

ওকে দেখলেও আমার কষ্ট হয়, আমাদের বাড়ির স্মৃতির সঙ্গে সে সব দিক থেকে জড়িত। আমি প্রায় শৈশব থেকেই সরোজিনীর হাতে মানুষ। তাই তার বাড়ির দাওয়ায় মুখোমুখি ব'সে তার সযত্নে সংগৃহীত সন্দেশ খেতে আমার কুণ্ঠার আর সীমা ছিল না।

সেও একটা অস্বস্তি বোধ করছিল বুঝলাম, এই প্রথম আমি ওর বাড়িতে ব'সে জলযোগ করছি।

সে বলছিল—জানো দিদিমণি, তোমার বাবার মুখের দিকে আর তাকান যায় না, আজকাল কারবারেও নাকি গোলমাল চলছে।

—এখনও বোধ হয় তেমনই বেশীক্ষণ বাইরেই কাটিয়ে দেন?

সরোজিনী মাথা নেড়ে বলে—আগের চাইতেও বেশী, তোমার মারও সেই অবস্থা।

চোখের সামনে দুজনের ছবি ভেসে উঠল—কি বিচিত্র উদাসীনতা। একত্রে থাকেন অথচ উভয়ের মধ্যে এতটুকু সংযোগ নেই। শুধু ব্যাঙ্কের চেকে অনেক সময় দুজনের সই প্রয়োজন হয়, আর একই পদবী ব্যবহার করেন। কি এমন সূক্ষ্ম তন্ত্রী আছে যা ওঁদের দুজনকে এখনও বেঁধে রেখেছে? কি সে গোপন, গভীর যোগ-সূত্র? না, শুধু দীর্ঘ দিনের অভ্যাস মাত্র। একজন মনীষি ত' বলেছেন, বিবাহটা একটা অভ্যাসযোগ। আর মা?—মিসেস সেজে থাকাটাও ত' কম ব্যাপার নয়।

আমি বললাম—আচ্ছা, সরো, সেই ভানুমতী হাজরা এখনও আসেন, তাঁর সেই মহিলা সমিতি না কি, আছে ত'?

—আছে বৈকি, আগের চেয়ে আরো বেড়েছে যাতায়াত, সেদিন আবার একজন কালো মতন মোটা সোটা লোক সঙ্গে নিয়ে হাজির।

—সত্যি?

—হাঁ, দিদিমণি, তিনি একজন ডাক্তার নাকি, অথচ আমাদের সরকার মশাই বললেন, লোকটা কোন মঠের না মিশনের সাধু! তবে গায়ে গেরুয়া নেই। দিব্যি ফিট্ ফাট্ বাবু।

—চমৎকার!

ভাবতে লাগ্‌লাম ভানুমতী হাজরার এই নতুন বন্ধুটি কে। গেরুয়াহীন সাধু!

সরোজিনী আরো বললে—সরকার মশায়ের কাছে শুনেছে সাধু নাকি 'কায়া-কল্প' না কি সব হয়েছে আজকাল, তাও করতে জানে।

বুঝলাম চাকর-দাসী মহলেও এই সব কথা আলোচনা চলেছে। আমাদের ফ্লাটের নীচের তলায় যেমন পাড়ার দাস-দাসীরা বিকালে এসে বসে খোস গল্প সুরু করে, আমার মা-বাবার কাহিনী নিয়েও ওদের মধ্যে তেমনই আলোচনা হয়। এই 'কালো লোকটি'র কথা আমার ভালো লাগেনি। সরোজিনীর বাড়ির দাওয়ায় বসে এই সর্বপ্রথম যেন আমার মায়ের আতংকগ্রস্ত বীভৎস মুখ আমার

চোখে পড়ল—মা এবং ভানুমতীর দল সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কতদূর যেতে চায়। তাই—ওঁদের মত উন্নাসিক সমাজেও কায়াকল্পের ভেল্‌কী দেখানোর জন্য, গেরুয়াহীন কালো সাধু এসে জোটে।

বয়স এবং সময়ের ভয়ে ওঁরা আতংকিত হয়ে উঠেছেন, ধ'রে বেঁধে যৌবনকে রাখা যাচ্ছে না, ঘষে মেজে রূপও ফুটছে না, তাই এই অপরিচিত পথে সুরু হয়েছে দুঃসাহসিক অভিযান।

আর আমি,—সেদিনকার সেই হিমেল রাতে সরোজিনীর হাত থেকে ফার, কোট নিয়ে যদি মহেশতলায় পাড়ি না দিতাম, যার ফলে, একান্ত আকস্মিক গতিতে উনি আর আমি একই সূত্রে বাঁধা পড়লাম, তাহ'লে আজ এই মেকী রাস্তার গোলোক-ধাঁধার ভিতর চোখ বেঁধে ঘুরতাম কানামাছির মতো। শুধু স্বর্ণ যাদের কাছে স্বর্গ, তাদের মধ্যে আরেকজন হয়ে নকল প্রেমের অভিনয় ক'রে মোমের পুতুল সেজে ঘুরে বেড়াতাম।

কিন্তু কার দোষ ? হয়ত এর ভিত্তি সেইখানে যেদিন মানুষ জীবন থেকে স'রে এসে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত শুধু গড়েছে যন্ত্র আর কারখানা, আর বাণিজ্যের বেসাতি, ফলে পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য পথে তারা চলে গেছে,—টাকা আরো টাকার সন্ধানে, 'আলো, আরো আলো' তাদের জীবনের নীতি নয়। অতিকায় দানবের খোরাক জোগানো যেমন কঠিন কাজ, তেমনই আধুনিকতম বিলাস আর ঐশ্বর্যের স্বর্ণ-শিখরে যারা ব'সে আছে তাদের সেই বিলাসের উপকরণ যোগায় হাজার হাজার বুভুক্ষু নর-নারী, যন্ত্রের মত তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে যন্ত্রদানবকে খুসী রাখে।

উনি একদিন বলেছিলেন, হয়ত মানুষ যেদিন জীবন ও প্রেরণা থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজেকে একটা চিন্তাশীল যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছে সেই দিনই এই বীভৎস ফ্রাঙ্কেনস্টাইন জন্মলাভ করেছে। মানুষ ভুলে গেছে, বেঁচে থাকার অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল সত্যের অভিব্যক্তি।

কিন্তু পরিণাম? মা আর ভানুমতী হাজরার কি পরিণতি? লোশন, ক্রীম, পাউডার যখন বিকৃতির চিহ্ন রোধ করতে পারবে না,—যখন হাজার টাকা দামের শাড়িতেও দেহের জৌলুষ বৃদ্ধি হবে না, তখন?

হয়ত তখনও পথের শেষপ্রান্তে এসে জীবনটাকে সেই বাদামের খোলার ভিতরকার ছোট্ট দানা হিসাবেই গ্রহণ করবে। অভিজ্ঞতা মানুষকে পরিণামে বুঝিয়ে দেয়, জীবনই একমাত্র বাস্তবতা।

অনেক পরে সরোজিনী বল্‌ল—জানো দিদিমণি, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় টাকাটা মানুষের ভালোর জন্যে নয়—সত্যি নয়। এতে তাদের ধারণা হয় টাকায় সবই কেনা যায়, তারপর ভাবে এর জন্য কাজ করার কোনো দরকার নেই, আকাশ থেকে টাকা ঝরে পড়বে—

আমি বললাম—সরো, তোমার কি ধারণা আমাদের সবায়েরই কাজ করা উচিত?

শুধু প্রশ্ন করা নয়, জবাবের জন্য তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম।

সরোজিনী হেসে বলল—আমার ঠাকুমা বুড়ি বলতো 'কাজ না করলে গতরে ঘুণ ধরে', কথাটা ঠিকই দিদিমণি, খাঁটি কথা—

সরোজিনীর মুখে সেই হাসি, এই হাসি আমার পরিচিত। কতদিন সকালে ঝড়ের মত ঘরে এসে ও জানলার পরদা সরিয়ে দিয়ে, মেঝের ওপর থেকে আমার ছাড়া কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখার সময় এমনই হাসি হেসেছে।

গ্রাম্য কথা 'কাজ না করলে গতরে ঘুণ ধরে', কথাটি বার বার মনে এল এক ঘণ্টা পরে যখন হঠাৎ মাকে দেখতে পেলাম। ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে ভীড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি, ট্রাম-বাস যা হয় একটা ধরব, এমন সময় দেখি পুলিশের হাতের ইঙ্গিতে আমার ঠিক সামনেই একটি বিরাট গাড়ি হঠাৎ একটা আওয়াজ ক'রে থেমে গেল।

ফুটপাথের অসংখ্য নর-নারীর ভিড়ে বাস-ট্রামের জন্য ঐ ভাবে অপেক্ষা করব কোনোদিন ভাবিনি, আজ আমি ওদেরই একজন, ঠিক এমন সময় যেন একটি স্মৃতি-পরিচিত ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল। হরিসিং স্টীয়ারিং ধ'রে বসে, পোষাক-পরিচ্ছদে তার গাম্ভীর্য আরো বেড়েছে, উদাস তার ভংগী, আর পিছনের সিটে ব'সে আছেন আমার মা—

তাঁকে হঠাৎ এ ভাবে দেখে আমার ত' নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। মার পোষাক-পরিচ্ছদে এতটুকু ক্রটী নেই, পথঘাট, রাস্তার ভীড়, ট্রাম-বাসের হট্টগোল, কোনো কিছুর দিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই, উদাসীন ভংগীতে অসহিষ্ণু হয়ে ব'সে আছেন তিনি, যেন পথ, জনতার উপস্থিতি, তাদের দৃষ্টি, তাদের আকৃতি, সব কিছু অন্য কোনো বিচিত্র জগতের, আর পৃথিবীর সংগে তাদের কোনো সংযোগ নেই।

'এই ভংগীটুকুও আমার অজানা নেই। আমার নিজের হাত-পায়ের মত তাঁর এই মনোভংগীটুকু আমার চিরচেনা, কিন্তু এই সব নয়। সেই প্রদোষান্ধকারে মনে হ'ল একটা মুখোস খসে পড়েছে, মার আকৃতির একটা রূপান্তর লক্ষ্য করলাম, মার মুখের এই অবসাদ-জড়িত ক্লান্তির ছাপ আমার চোখে একান্ত অবিশ্বাস্য।

যেন একটা চোখ-ধাঁধানো আলো, মুখ থেকে সব ছায়া সরিয়ে নিয়ে তার নগ্ন রূপটা অকস্মাৎ প্রকাশ ক'রে দিয়েছে। যে সব কুঞ্চনরেখা সহসা চোখে পড়ত না, তা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর সমস্ত মুখটাই পরিবর্তিত হয়েছে, যেন পিঞ্জরাবদ্ধ কোনো প্রাণী রুজ ও পাউডার-চর্চিত মুখের ঐ মুখোস থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও—কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ আমাকে যেন গাড়ি থেকে হাতছানি দেয়, আমি উন্মত্তের মত গাড়ির কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় পাহারাওলা-র হুইসিল বেজে উঠল,—মার গাড়ি কিছু ধোঁয়া ছেড়ে সবেগে ছুটে চ'লে গেল।

ধর্মতলা স্ট্রীটে যাত্রী-বোঝাই চলন্ত বাসে ব'সে কেবলই মনে হতে লাগল, ভুল দেখেছি, বহু আলোকের বিচিত্র সমাবেশের সংগে আমার কল্পনা মিশে গিয়ে এই

বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। সরোজিনীর কায়াকল্পের কাহিনীও আছে, তা ছাড়া আমিও ত অনেক কাল বাড়ি ছাড়া, হয়ত ওঁর মুখের আকৃতি আমার মনে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

মনকে বোঝালাম, মানুষের ত' পরিবর্তন হয়, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়। প্রতিটি মুহূর্তেই ঘট্‌ছে এই পরিবর্তন। আমিও বাড়ি ছেড়েছি কয়েক মাস হয়ে গেল, এইসব ব'লে মনকে যতই কেন বোঝানোর চেষ্টা করি না কেন সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার চোখে ট্রাম-বাস যাত্রীর সেই অপেক্ষমান জনতার ছবি ভাসতে লাগল। হঠাৎ থেমে যাওয়া গাড়ি ঘোড়া, আর সেই গাড়ির ভিতর থেকে ফুটে ওঠা আমার মার মুখ। আমার মনটা বেদনায় ভরে গেল—মনে বাসনা হ'ল, যে অবশ্যম্ভাবী আইনে যে বীজ বপন করা হয় তারই ফসল তুলতে হয়, সেই আইন যদি প্রতিরোধ করতে পারতাম।

সেই শনিবার আবার মহেশতলায় গেলাম। প্রথম দিনের মত সেই এরোড্রোমের পাশের গাছপালার ছায়াঘেরা পথ ধরেই চললাম, আর আমাদের—সেই ডানদিকের মোড়ে এসে দাঁড়ালাম।

আবার দেখলাম সেই মাঠ আর মাটি, আকাশ আর আঙিনা,—মাঠের সবুজ আর আকাশের সোনা রঙ সব কিছুই, তবে কোথাও সোনার বদলে সবুজ আর সবুজের পাশে রূপালি কাশ ফুল—

মাঠে সোনালি ধান, ওদিকে শাদা কাশ ফুল, শরৎ এসে পড়েছে—হাওয়ায় হাওয়ায় ধানের শীষ তরঙ্গায়িত হচ্ছে। আমরা আর একবার সেই লেভেল ক্রসিং-এর গেটের ধারে এসে দাঁড়ালাম,—তবে আজ আর পাখির আওয়াজ নেই।

আমি বললাম—যেন সব পাখিরাই পালিয়েছে, এ আমার ভালো লাগে না—

উনি বললেন—এ হোল পরিতৃপ্তির নীরবতা, জানো না বাইবেলের সেই কথা—

Well done, thou good and faithful servants, enter into rest—আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, ওরাও অনেক পরিশ্রম করেছে, এখন শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে,—

আমি বললাম—আমরা সবাই ব্যস্ত ছিলাম। মনে ভাবতে হাসি পেল যে এখন পাখির ছানারা উড়তে শিখছে, কাঠবিড়ালী সংগ্রহ করছে তার সারা বছরের খোরাক, খরগোসের ছানাগুলো একমনে ধাড়ি খরগোসের ভাবভংগী অনুকরণের চেষ্টা করছে, আর আমাদের ফ্লাটে উনি জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নতুন লেখার কথা ভাবছেন আর আমি তাড়াতাড়ি রান্না সরবার জন্য 'প্রাইমাস' স্টোভ্‌টা পাম্প করছি।

সেই মুহূর্তে মনে হ'ল আমরা সবাই এক বিরাট সমবায়ের এক একটি অংশ-বিশেষ; পাখি, কাঠবিডালী, মানুষ সকলে মিলেই এই সমগ্র জীবনের অভিব্যক্তি, একজন অদৃশ্য স্রষ্টিকারের ইঙ্গিতে সকলে নিঃশব্দে যে যার কাজ ক'রে চলেছি।

তের

রাঙা-কুঠি

শেফালী বলছে—শুনেছ, 'রাঙা-কুঠি' ভাড়া দেওয়া হবে ?

অন্ধকারে শেফালীর মুখ দেখতে না পেলেও ডেক চেয়ারে শায়িত তার দেহের প্রান্তরেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

সেদিন বড় গুমোট, গাছের পাতাটিও নড়ছে না, তাই সেদিন মহেশতলা ভবনের সবাই মিলে মাঠের ওপর বেতের চেয়ার টেনে এনে বসে সন্ধ্যা যাপন. করছেন।

বাড়ির ভিতর বৃন্দাবনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। পল্লী প্রান্তর সেই সন্ধ্যাতেই নিস্তব্ধ। ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকাব ডাক শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ উনি প্রশ্ন করলেন শেফালীকে—কি বললে—? আমি ভাবলাম ওঁর এত মাথা ব্যথা কিসের।

রমানাথ দা গম্ভীর গলায় বললেন—গোবিন্দ শুনছি শীগ্‌গীর আমেরিকায় যাচ্ছে, তবে আমি ওর কথা ধরিনা, কিছুই ঠিক থাকে না—, ওর ওপর নির্ভর করা চলে না জয়ন্ত—'

উনি বললেন—না, তা করব কেন ? তা ছাড়া আমার কলকাতার বেক-বাগানের ফ্ল্যাটবাড়ি কি দোষ করল ?

রমানাথ দা বললেন—ঠিক বলেছ, এই ভেকবাগানে না এসে ঐ বেকবাগানেই ভীড়ে থাক—'

শেফালী কিন্তু বল্‌ল—চিরজীবন কি ঐ ফ্লাট বাড়িতেই চালাবে নাকি ? ঐ অন্ধকার ঘুপ্‌চি ঘর বুঝি তোমাদের খুব পছন্দ ? দমবন্ধ ক'রে ঐ ভাবে আটক থাকা—?

আমি বললাম—কোথায় আবার দমবন্ধ ক'রে আটক থাকি—অসুবিধা সেদিকে নয়, অসুবিধা শুধু আমাদের উষাদি'কে নিয়ে, বাবা, যা শুচিবাই—, দিনরাত খিট্‌খিট্‌ করছে। কিন্তু 'রাঙা-কুঠি'টা কি জিনিষ ?

উত্তর দেয় রমানাথের ছোট ভাই সোমনাথ। ঘাসের ওপর একটি পাতলা সতরঞ্চ বিছিয়ে শুয়েছিল সোমনাথ, সেইখান থেকেই বলে উঠল—'জানোনা মিনতি দি', ঐ ত' রাঙা ঠাকুমার বাড়ি। বিয়ের পর থেকে ওঁরা ওই বাড়িটাতেই ছিলেন বরাবর। অর্থাৎ সেই জয়রামপুরের রাজাঠাকুরের বাড়ি।

আমার জীবনের এটিও আর একটি ঘটনা, যা চিরদিন স্মরণে জেগে থাকবে। সেই সময়কার সব কথাই মনে স্পষ্ট হয়ে আছে।

ওদের বাড়ির সামনে একশো বছরের পুরাতন বিরাট দেবদারু গাছ দুটি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। শরতের মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ, নক্ষত্রগুলি যেন মাটির কাছে নেমে এসেছে। অনেক দূরে বজবজের ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দ, যেন অন্য জগতের সুর। মহেশতলা ভবনের গেটের পাশের ঝাঁকড়া-মাথা গাছটায় অসংখ্য হাসনু-হেনা ফুল ফুটেছে, কি মন-মাতানো স্নিগ্ধ গন্ধ। মধুর অথচ তেমন তীব্র নয়, কিন্তু একেবারে মাথায় চড়ে বসে।

শুধু যে সেই মুহূর্তটির সুর, একথা সেকথা, শাদা-কালো, ইনি আর উনি, মনে থাকে তা নয়, আরো কিছু আছে, জীবন যেন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,—তার পরিপূর্ণ রূপের কি বিচিত্র প্রকাশ !

তখনই কেমন আমার মনে হ'ল এই রাঙা-কুঠিতেই হয়ত শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে আমাদের। এই জানার মধ্যে কোনো অপরূপ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব ছিল না, তবু আমার মনে এই কথাটি সেদিন সিনেমার ছবির মত ভেসে উঠেছিল। এ

যেন দীর্ঘ অদর্শনের পর অতি-পরিচিতের দর্শন লাভ। একটা হেঁয়ালির হঠাৎ খুঁজে পাওয়া সমাধান-সূত্র।

কিন্তু ব্যাপারটি কত অবাস্তর, আমরা কি ক'রে এখানে থাকতে পারি, প্রতিদিন এই মহেশতলা থেকে ইটিলিতে সংবাদপত্র অফিসের দোরগোড়ায় কি ভাবে উনি হাজিরা দিবেন! গ্রীষ্ম ও শীতে না হয় সম্ভব হ'ল,—কিন্তু বর্ষায়?—এই জল-কাদা ভেঙে উনি যাবেন কি ক'রে? এখানে থাকার কথা ভাবাই যায় না, অবশ্য খবরের কাগজ যদি ছেড়ে দেন সে আলাদা কথা।

কিন্তু—সেই বা কি ক'রে সম্ভব!

খবরের কাগজ ছাড়লে সংসার চলবে?

লিখবেন বটে উনি; কিন্তু লিখে কেউ সংসার চালাতে পারে? বিশেষতঃ এই বাংলা দেশে?—সিনেমায় যাঁরা গেছেন তাঁরা একরকম অবশ্য গুছিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু নতুন লোকের জীবনের সংগ্রাম বড় কঠোর।

শাক-সব্জী হয়ত করা যাবে, ফসল উদ্বৃত্ত হ'লে বিক্রী করাও চলতে পারে, কিন্তু তাতে কি সব খরচ মিটবে? কল্পনা-নেত্রে মাঠের ওপর কোদাল ও সাবল হাতে আমাদের দুজনের কর্মরত অবস্থা মনে ভেসে উঠ্‌ল।

মাঠের ওপর বীজ ছড়িয়ে দেব; তারপর একদিন জাগবে অঙ্কুর, ফলে ফুলে তাই একদিন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। বর্ষাধৌত নীল মাঠে ফসল কুড়িয়ে বেড়ানোর কি আনন্দ!

রমানাথ দা ওঁকে বললেন—যাও না একবার মিনতিকে নিয়ে, দেখেই এসো না বাড়িটা, বাড়িত নয় যেন ছোট একটি কেল্লা, তা ছাড়া গোবিন্দলালও হয়ত খুসী হবে তোমাদের দেখে, রাঙা দিদিমা—

আবার সেই রাঙা দিদিমা—হরতনের টেক্কার মত মুখ, ভাসা ভাসা দুটি স্বপ্ন-বিজড়িত চোখ, ছবির ফ্রেমের ভিতর থেকে মুখখানা ভেসে এল।

রাঙা দিদিমা! তখনকার কালের সকল বাধা-বিরোধ, সংস্কার ছিঁড়ে

ফেলে যা ভালো বুঝেছিলেন করেছিলেন, জীবনটা নিজের মনের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন।

রাঙা-কুঠি তাঁর নিজের হাতে গড়া, ঐ খানেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন আর আমি মিনতি, আকৃতিতে নাকি স্বয়ং রাঙাদিদিমা, আমি পারবো না আমার দুঃসাহসের পাড়ি সম্পূর্ণ করতে? তিনি যা করেছেন আমারও তা করা উচিত। আমার বয়স কম, শিক্ষা আছে, সামর্থ্য আছে,—আর কল্‌কাতার ফ্ল্যাটের শুচিবায়ু-গ্রস্ত উষাদি'র মত বিরক্তিকর আর কি আছে!

—হয়ত ওদের ক্ষেত খামারে জয়ন্ত, তোমার মন বসে যাবে। মেসোমশাই এতক্ষণে বললেন।

প্রথম যেদিন মহেশতলা ভবনে এসেছিলাম সেদিন এই প্রসঙ্গ আমার ভালো লাগেনি—কিন্তু আমি আমার হাত আর হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়েছিলাম।

উনি বললেন—হ্যাঁ, হাতে কলমে খানিকটা পল্লী সংস্কার করার সুযোগ পাব। তোমারও ভালো লাগ্‌বে, কি বল মিনতি?

আমি শুধু বললাম—হ্যাঁ।

মনে মনে জানতাম প্রশ্নের মত উত্তরটাও ফাঁকা।

ফাঁকা মাঠের ওপর ঐ একটি বাড়ি। বাড়ির পিছন দিকে অনেক গাছপালা, নারকেল, তাল, দেবদারু, সুপারি সবাই এক সঙ্গে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে,—একটা কাঠের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। সামনের বাগানটা তেমন বড় নয়,—পিছনের মাঠ প্রকাণ্ড, তার অর্ধেকটায় কিছু ফসল হয়।

আগেকার আটচালা ফ্যাসনের বাড়ি, মাটি থেকে অনেক উঁচু,—সামনে একটা চণ্ডীমণ্ডপ। তার গোলপাতার ছাউনি সরিয়ে রাণীগঞ্জের টালি দেওয়া হয়েছে, ভিতরটা কিন্তু চমৎকার, চারদিক ঝক্‌ঝক্ করছে। প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর তিন খানা, প্রশস্ত বারান্দা, রোয়াক, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, টুকিটাকি জিনিষপত্র

রাখার জন্য ফালিঘর—অভাব কিছুর নেই। কর্তা দাদামশাই নাকি নিজে সব বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। নেই শুধু ইলেকট্রিক আলো, কলের জল। আছে একটা বড় পুকুর। আর একটা নতুন বসানো টিউবওয়েল।

গোবিন্দলাল বাবু কুকুর-রসিক ব্যক্তি, পরণে পাজামা, সঙ্গে দুটি বিলাতী কুকুর—বোধ হয় স্প্যানিয়েল জাতীয়। সব দেখা হয়ে যাওয়ার পর গোবিন্দবাবুর বৈঠকখানায় এসে বসলাম। আগেকার কালের চাদর-বিছানো ফরাসও আছে, সেই সঙ্গে বউবাজারের সোফাসেটও রয়েছে, ঘরের সাজ-সজ্জায় দেশী-বিলাতীর অপূর্ব সংমিশ্রণ। আমাদের জন্য সেই রাত আটটায় চায়ের জল চড়াবার হুকুম দিলেন।

সত্যি তিনি আমেরিকায় যাচ্ছেন, তবে সেই মার্চ এপ্রিল মাসে, আইয়োআ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক হিসাবে বুঝি একটা কনট্রাক্ট হয়েছে—কিন্তু এতদিনের বাড়ি, বিক্রী করার ইচ্ছা নেই, যাকে তাকে ভাড়া দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন। তবে জানা শোনা কাউকে রাখতে আপত্তি নেই, আমেরিকা ভালো না লাগ্‌লে আবার দেশেই ফিরে আসবেন।

শীর্ণ, গৌরাঙ্গ এবং দীর্ঘদেহ গোবিন্দবাবুকে ভালো ক'রে দেখলাম, প্রশস্ত ললাট, মাথার উপর চক্‌চকে টাক, কিন্তু কি নাক, সত্যি যেন তিলফুল জিনি নাসা। শেফালীর কাছে একটু আগেই জেনেছি স্ত্রী নাকি বছর দুই আগে একজন পাঞ্জাবী এটর্নীর সঙ্গে চলে গেছেন। এমন লোককে ছেড়ে পাঞ্জাবী এটর্নী! এটর্নীটি অবশ্য ধনী, কিন্তু অর্থটাই কি সব কিছু? ভদ্রমহিলার রুচির প্রশংসা করতে পারলাম না।

তিনি হঠাৎ বললেন—জানো রমানাথ, আমার হাতে কয়েকটা পুরানো চিঠি পত্র এসেছে,—দলিলও আছে তার সঙ্গে একটা, সে ভারী মজার ব্যাপার। একদিন দুপুরে চলে এসো, এইখানেই খাওয়া দাওয়া যাবে, তোমাকে সব দেখাব। তাইত' বলি এ বাড়ি যার তার হাতে ছাড়লে, তোমাদের রাঙা-দিদিমার আত্মা আমাকে ক্ষমা করবে না।

রমানাথ দা বললেন—জয়ন্তরা এখনও কিছু ঠিক করেনি, একবার দেখতে এসেছে।

ঠিক কিছু হয়নি বটে, কিন্তু একটা সেতু বা স্তম্ভের মত অচল, অটল বস্তুর সামনা-সামনি এসে পড়েছি মনে হ'ল। গোবিন্দলাল বাবুর বৈঠকখানায় সেই স্বল্লালোকিত ঘরে ব'সে আছি, পাশে তাঁরই কুকুর, মাথার ওপর বড় বড় কড়িকাঠ, —জানলা দিয়ে ভেসে আসছে ম্লান চাঁদের আলো আর ফোটা ফুলের সুগন্ধ। সেইখানে বসে সেই রাতেই আমার মনে হ'ল জীবনের চিরন্তন-লোকের দিকে আর একধাপ এগিয়ে চলেছি।

চোদ্দ

কয়লার ময়লা

—অসম্ভব—এ তোমার পাগ্‌লামি—সার্ট খুলতে খুলতে এই কথা ব'লে উনি সার্টটি চেয়ারের হাতলে ছুঁড়ে ফেললেন। ওঁর মাথার চুলগুলি ছোট ছেলের মতো সোজা হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম—কেন হবেনা, দেখো রাঙাদিদিমারা পেরেছিলেন, আর আমরা পারবো না? তাঁদেরও ত' শুনেছি তেমন টাকাকড়ি ছিল না—

আলনা থেকে গামছা টেনে নিয়ে উনি বললেন—তুমি একটি খুকী! রাঙা-দিদিমায় পেয়েছে তোমাকে। এটা বুঝছো না কেন তখনকার অবস্থা এখনকার চেয়ে ভালো ছিল, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, দুটো বড় বড় যুদ্ধও হয়ে গেল—

আমিও ছাড়বার পাত্রী নই, বললাম—সে কথা সত্যি, কিন্তু তার মানে এ নয় যে ওঁরা খুব স্বচ্ছন্দে কাটিয়েছেন। বলো তাই কিনা? তুমি তোমার ঐ বিপ্লব, সেবা-সংঘ খবরের কাগজ ইত্যাদির ভূত মাথা থেকে নামিয়ে যে কাব্য আর সাহিত্য রচনা করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার নেই।

উনি মুখ কালো ক'রে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখ, যে কথা জানো না, সে বিষয়ে কোনো কথা বোলো না। ধরো, আমি খবরের কাগজের কাজ ছেড়ে, পার্টির কাজ ছেড়ে,

গ্রামে গিয়ে বসে রইলাম,—দু'চার টাকার লাউ কুমড়ো বেচে আর মাঝে মাঝে গল্প, কবিতা লিখে দশ, বিশ টাকা রোজগার করলাম, কিন্তু যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি, যদি আরো টাকার প্রয়োজন হয়, তখন—আমাদের ত' আর গচ্ছিত ধন নেই—

—তা নেই, তা ছাড়া তুমি বিপদের ঝুঁকি নিতে ভয় পাও।

উনি হঠাৎ অত্যন্ত রেগে উঠে বললেন—আমি তোমার বাবার মত ধনী নই, —যদি বিলাসের জীবনই তোমার কাম্য হয়, তাঁর কাছেই ফিরে যাও।

—তুমি এ কথা বললে ? তুমি আমার বাবার মত নও জানি, তুমি কবিও নও—তোমার রোমান্সবুভুক্ষু মন দেশের কাজের নাম ক'রে সস্তা থ্রিল খুঁজছে। দেশের জন্য কি তুমি করেছ ?

উনি উত্তেজিত হয়ে আমাকে ঠেলে বিছানায় ফেলে দিলেন। বললেন—ছি, ছি! বড় ভুল করে ফেলেছি দেখছি। হাজার ধুলেও কয়লার ময়লা যায় না।

ওঁর চোখদুটো জ্বলছে, রাগলে যে ওঁকে এমন বিশ্রী দেখায় কে জানতো। উনি আবার আমার হাতদুটো চেপে ধ'রে ব'লে উঠলেন—কেন একথা বললে তা জানতে চাই, তোমাকে জবাব দিতেই হবে—

না রেগে বললাম—ছাড়ো, আমার লাগছে।

—লাগুক—আমি জবাব চাই।

—জবাব আবার কিসের, গ্রামের স্কুলে আমি একটা মাস্টারি জুটিয়ে নেব, আর বাগানে শুধু লাউ কুমড়ো নয় আরো কিছু যাতে জন্মায় তার ব্যবস্থা করবো। তুমিই ত' সে দিন আমাকে পল্লীসংস্কার সম্পর্কে অত শত বললে।

—আর আমি ঘরে ব'সে তোমার সেই দাসীবৃত্তি দেখব, চমৎকার—

—তুমি একটি হাঁদারাম, বসে থাকবে কেন, তুমিও খাটবে, 'ছেড়ে মানের বালাই চল কোদাল চালাই' করবে—

—আমি বলছি না, ও সব হবে না, হয়েছে ? এদিকে আমার হাত তেমনই চেপে আছেন।

আমি বললাম—রূপার থালে ক'রে তোমাকে সোনার ডিম দেওয়া হচ্ছে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাও,—কেবল কথা, কথা, আর কথা! বক্তৃতা দেওয়াটাই তোমার পেশায় দাঁড়িয়েছে। রমানাথদা'র দিকে তাকাও, ওঁরা জানেন কি ভাবে বাঁচতে হয়, কেমন ক'রে বাঁচতে হয়। তোমার কথা শুনে আমার জ্ঞান হয়েছে—

সেই মুহূর্তে ওঁর মুখের ও চোখের ভয়ংকরত্ব আমাকে শঙ্কিত ক'রে তুললো,—সহসা উনি হাত দু'টি ছেড়ে দিলেন—আমার বুকের ওপর প'ড়ে ব'লে উঠলেন—প্রায় তোমাকে মেরে ফেলছিলুম আর একটু হ'লে—

আমার কাঁধের উপর ওঁর উষ্ণ নিশ্বাস, কানের কাছে মৃদু গুঞ্জন। অশান্ত শিশুর মাথায় জননী যেমন হাত বুলিয়ে দেন আমিও সেই ভাবে ওঁর মাথার চুলগুলির ভিতর আঙুল চালিয়ে ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম—বললাম—কেন আমাকে মারতে?

—কারণ তুমি সত্যি কথাই ব'লে ফেলেছিলে। কিংবা ভয় পেয়েছিলুম মিনতি। উপায় নেই, ওর হাত-থেকে নিষ্কৃতি নেই, আতংক-মুক্ত হওয়া বড় কঠিন। আমার বাবা সরকারী হাসপাতালের ফ্রি বেডে মারা গিয়েছেন—সেই দুঃস্বপ্নই আমি দিন-রাত দেখি, তোমার আমার জীবনেও ত' সেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, অর্থ না থাকলে অনর্থ, থাকলেও অনর্থ। তোমাকে অনেক দুঃখ দিচ্ছি, আরো দুঃখের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে আমার ইচ্ছে নেই।

আমি বললাম--আমাদের ভালোবাসাকে তুমি দুর্বল করে তুলছ—তাকে আরো শক্তিমান ক'রে তুলতে হবে। ভয় নেই তোমার, হাসপাতালে মরবো না আমি।

—না-না, ওকথা মুখে এনো না।

আমি আবার বললাম,—আমি কিন্তু তোমার জীবনের পথে একটা বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। একদিন হয়ত তার জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা করবে, মনে হবে আমার জন্যই তোমার কোনও অভিলাষ পূর্ণ হয়নি।

—তুমি? তোমার জন্য?

—হ্যাঁ, আমি। আমিই সেই অদৃশ্য শৃঙ্খল যা তোমাকে বেঁধে রেখেছে। আর তার জন্য তুমিই দায়ী।

একথার জবাবে উনি ঠোঁট দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরলেন গভীর আবেগে। আমি আবার বললাম—দেখ, তোমার লেখার ক্ষমতা আছে, জীবনটাই যদি সব হয়, সেই জীবন তোমাকে লেখক ক'রে সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে আছে—'জীবনে পরম লগন, কোরো না হেলা, কোরো না হেলা,'—তোমার যতটুকু ক্ষমতা কাজ ক'রে যাও। আমি বলছি খবরের কাগজ যা দেবে তার চেয়ে বেশী তুমি শুধু লিখেই হয়ত একদিন পাবে। দু'নৌকায় পা চলে না—

উনি বাঁ হাত দিয়ে সুইচটা টিপে আলোটা নিভিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি আমাকে পেশাদার লেখক ক'রে তুলতে চাও না?

—পেশাদার কি না জানি না, তবে ঐ কাজটাই তুমি সহজে পারবে। জানো, আমার মনে হয় তুমি যদি কাজ সুরু করো তাহলে নতুন নতুন পথ আপনি খুলে যাবে। আমাদের শুধু ভূমিকাটা সেরে ফেলতে হবে—

উনি আমাকে আরো কাছে নিয়ে বললেন—জানি, জানি, আর সেই নরকে তুমি অনাহারে মরবে।

—আমি কি এখন কার্পেট মোড়া স্বর্গে ব'সে আছি? তোমার কল্পনা শক্তি, তোমার প্রতিভা নষ্ট হচ্ছে একথা ভাবতেই আমার কষ্ট।

আমার সারা অঙ্গে ওঁর সুমধুর স্পর্শ অনুভব করলাম, দু'টি সবল বাহুর বাঁধনে আরো নিবিড় ক'রে বুকের ভিতর টেনে নিলেন।

সারা শীতকালটা সে বছর ঐ ফ্ল্যাটবাড়িতেই কাটালুম। এই শীতকালটি আমি ভুলিনি।

গ্রীষ্ম এবং শরতে যে পথটিকে প্রাণরসে উচ্ছল মনে হয়েছে সেই পথ তখন জনহীন, শীতকালে এত বৃষ্টিও আর কখনো দেখিনি।

আমি একান্ত একা থাকতাম, উনি ইদানীং নানা কাজে ব্যস্ত, পার্টির কাজ, খবরের কাগজ, তারপর বাড়ি ফিরে কিছু লেখাপড়া। পার্টির কাজ যে কোন্ পথে চলেছে ঠিকমত বোঝা যায় না। নিজে থেকে আমাকে কিছু যদি না বলতেন আমিও কোনো খবর জানতে চাইতাম না, তবে এটুকু জানতাম দেশে যেমন একটা সংকটময় কাল চলেছে, তেমনই অশান্তি আছে ওঁদের দলের মধ্যে। এই নির্জন ঘরটিতে শুধু সেলাই আর সামান্য গৃহকার্য নিয়ে দিন আর যেন কাটে না, তখন না বুঝলেও এখন জানি এই নিঃসঙ্গতার দুঃখ আমার মনের ওপর একটা ভারী বোঝা হয়ে বসেছিল।

আমি একা একা খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ঘর-দোর পরিষ্কার করতাম। বাড়ির সামনের ডাস্টবিনে গিয়ে আবর্জনাও ফেলেছি। কলতলায় এসে বাসন মেজে নিয়েছি—কিন্তু কতক্ষণের কাজ, সব কাজই যেন হঠাৎ ফুরিয়ে যেত,—তখন ওঁদের সংবাদপত্রটির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা বার বার পড়তাম।

মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ির ড্রেনটা অপরিষ্কার হয়ে থাকত, মুখটা নোংরা বোঝাই হয়ে সব জল আটকে দিত, সারা উঠান সেই নোংরা জলে প্লাবিত হ'ত,—কলতলায় এসে বাসন মাজার আগে সেই নর্দমাও নিজের হাতে পরিষ্কার করেছি কত দিন। উনি জানতে পারলে রাগ করতেন, কিন্তু বাড়ির গিন্নী উষাদি, খুসী হতেন, আর সব ভাড়াটেদের উদ্দেশ্যে বিড় বিড় করতেন।

সেই সময়, সেই নিরালায় বসে উনি যে ছোটখাটো তুচ্ছ বস্তুর কথা বলেছিলেন সেই কথা আমার মনে পড়ত। কতদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের ধারে কত কি দেখেছিলাম, কত ছোটখাটো কাহিনীর উপাদান তার ভিতর ছড়িয়ে ছিল, কে তার

হিসাব রেখেছে। শীতের শেষে পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে থাকত, দূরে উইলসন মেমসাহেবের বাড়ির গেটে ফুটত বুগেনভিলিয়া—সব জড়িয়ে কি অনাড়ম্বর বর্ণসমারোহ।

এইসব ছোটখাটো বস্তুর সঙ্গে যেন আমার আত্মার আত্মীয়তা—কি নিবিড় অন্তরঙ্গতাই না অনুভব করেছি। আমার জীবনের সঙ্গে ওরাও যেন জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যার পর উনি বাড়ি ফিরলে আমার এই নিঃসঙ্গতার দুঃখের অবসান ঘটতো। রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে রাখতাম, তাই উনি হাত-পা ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেই আমরা শোবার ঘরে এসে বসতাম। চিনেদের কাছে কেনা ক্যানভাসের ডেকচেয়ারে শুয়ে পড়ে কোনো কোনো দিন উনি কবিতা পড়তেন—রবীন্দ্রনাথ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য, টি. এস. এলিয়ট, ডে লা মেয়ার, হুইটম্যান, স্যাণ্ডবার্গ। আমার খুব ভালো লাগত, কিছু বুঝতাম কিছু আবার বুঝতাম না, তবু ওঁর আনন্দের অংশ আমিও গ্রহণ করতাম।

ওঁদের 'নবভারত' দৈনিক পত্রের অফিসে বিজয়া-সম্মেলন উপলক্ষ্যে আমাদের উভয়ের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। ফাগুন মাসে আমাদের বিবাহের পর এক আধবার সিনেমায় যাওয়া এবং মহেশতলা যাওয়া ছাড়া আমরা আর কোথাও একত্রে যাইনি। এক হিসাবে এই প্রথম সামাজিক সম্মেলন। আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা না থাকলেও ওঁর আগ্রহাতিশয্যে রাজী হলাম। মুস্কিল, কি প'রে যাব সেই এক সমস্যা। অনেক কাপড়চোপড় বা'র ক'রে কোনটাই পছন্দ হ'ল না। প্রাক্-বিবাহ যুগের দু' চারখানি শাড়ি আমার ছিল, কিন্তু তার এক একখানির দাম প্রায় ওঁর দুমাসের মাইনের সমান। লোকে কি মনে করবে! আর কারো শাড়ি একখানা চেয়ে নিয়ে পরতে পারতাম, কিন্তু আমার মনোভাব জানতে পেরে উনি দেখলাম একটু অসন্তুষ্ট হলেন। অবশেষে ঠিক হল খদ্দরের শাড়ি সকল আসরের উপযুক্ত।

আমি ওঁর পছন্দমত সাজসজ্জাই করেছিলাম এবং যথাসময়ে ইটিলিস্থ 'নবভারত' পত্রিকার অফিসে হাজির হয়েছিলাম।

যথারীতি গান, বাজনা, বক্তৃতা, চা, জলযোগ। স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর লালচাঁদ কানোরিয়া হেসে হেসে সবায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের কাছে এসে আর উঠতেই চান না। একদিন তাঁর বাড়িতে সবাইকে ডাকবেন সেদিন আমিও যেন যাই। দেশের কাজেই উনি এই খয়রাতি কারবার ফেঁদেছেন আর লোকসান দিয়েছেন! মুনাফা কিছুই নাকি নেই। পরে শুনলাম—কাগজের যে মোটা কোটার পারমিট পেয়েছেন তার সামান্য অংশ খরচ ক'রে বাকীটা কালো-বাজারে চড়া দামে বিক্রী করেন, ছাপা কাগজের চাইতে শাদা কাগজের কারবারই ওঁর জমেছে বেশী। এই আসরে যাঁরা ভদ্র, ভব্য সেজে এসেছেন—বুকের কান্না চেপে মুখের হাসিতে আসর মাত করছেন, তাঁরা কোন্ শ্রেণীর জীব? জীবনের উদ্দাম স্রোত এই পোষাকী সভ্যতায় তাঁরা রুদ্ধ ক'রে রেখেছেন!

ফেরাব পথে ওঁকে বলেছিলাম—ওরা সর্বদাই হয়ত ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে এই পোষাকী ভদ্রতা বজায় রাখতে পেরেছে ব'লে। প্রকাশ্যে নিজেকে নাস্তিক ব'লে সবাই জাহির করে, কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন আকুল হয়ে সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে মাথা নত করে।

উনি বলেন—বাঃ বেশ কথাটা বলেছ ত'—তবে ওদের দোষ দেওয়া যায় না, এ হ'ল চিন্তার বিকৃতি। নিজেদের জীবনে ওরা যে সৌন্দর্য খোঁজে তা পায় না ব'লেই আজ এই মনোবিকার ঘটেছে।

—অন্যরকমও ত' হতে পাবে, হয়ত ওদের মনের অতিরিক্ত সংশয়ের ফলে সৌন্দর্য ভয়ে পালায়।

—কিন্তু ও আলোচনা কেন? এতে কি এসে যায়?

—না, আসে না যায় না কিছুই,—তবে মনে মনে চেয়েছিলাম যাতে ওদের ভালো লাগে—

—না, তা চাওনি, চেয়েছিলে ওদের চোখে তোমাকে ভালো লাগাতে।

—তা ত' হয়নি—

—একই কথা, নিজেদের চিন্তাতেই আমরা আকুল,—কারো সঙ্গে দেখা হ'ল, পাঁচমিনিট কথা হ'ল, আবহাওয়া থেকে সাময়িক রাজনীতি। সে তোমার পোষাকটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল—তারপর তুমি এই ছ-সাতটা কথা ও নমস্কার প্রতিনমস্কারটুকুর হিসাব নিকাশ ক'রে মানুষটার মনটাও বুঝে নিতে চাও, অতো সহজ নয়। সে হিসাব ছোট ছেলের হাতে আঁকা প্রথম ছবির মতই বিকৃত হবে—

—সেটাও কি আমাদের দোষ? কেউ-ই চায় না যে, তাকে কেউ জানুক, দেখুক তার আসল রূপ। এখন আমরা কাউকে তার হাতে আমাদের একটা মোটামুটি নক্‌সা দিয়ে চাই যে, সেইটি সম্পূর্ণ ছবি হিসাবে সে গ্রহণ করুক। লক্ষ্য রাখি অবাঞ্ছিত অংশ যেন তারা না দেখে।

—তবু এই সব মিথ্যাচার আর ভণ্ডামির নীচে, আমাদের এই অহমিকা আর দম্ভের আড়ালে—লুকিয়ে আছে আসল মানুষ। একদিন সেই মানুষকে খুঁজে পাব, সেই দিন সব গ্লানি ঘুচে যাবে। আমাদের প্রতিবেশীকে সেই দিন আপন জন ব'লে গ্রহণ করব, আপন পর ব'লে আর কিছু থাকবে না—

—অর্থাৎ সেই সবাই রাজার দেশ।

—সব পেয়েছির দেশ, সবাই সেখানে সব পাবে।

আমরা বাড়ির দোর গোড়ায় এসে পড়লাম।

পনেরো

লাভ লোকসান

হঠাৎ একদিন পোস্ট অফিসের সামনে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেভিংসব্যাঙ্কে সামান্য কয়েকটা টাকা ছিল সেই টাকা তুলে আনার উদ্দেশ্যেই পোস্ট অফিস গিয়েছিলাম। ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল—গোবিন্দবাবুর আপাদমস্তক বর্ষাতি মোড়া, তাই সহজে চিনতে পারিনি। উনি কিন্তু বৃষ্টির মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে হাসতে লাগলেন, নয়নে সেই স্নেহ-করুণ দৃষ্টি। /

চিনতে পেরে ব'লে উঠলাম—কি আশ্চর্য! আপনি যে এ পাড়ায়?

গোবিন্দবাবু একটু ম্লান হেসে বললেন—আমার পিসিমা থাকেন কন্‌ভেন্ট লেন-এ, তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। মাঝে মাঝে আসি। আমিই তাঁর একমাত্র গুণধর ভাই-পো।

আমি কল্পনানেত্রে বৃদ্ধা পিসিমাকে দেখে নিলাম—তারপর বললাম—তিনি নিশ্চয়ই আপনার আমেরিকা যাত্রা পছন্দ করবেন না।

গোবিন্দবাবু মাথা নাড়লেন—

ছাতি দিয়ে পথের ওপরকার একটি ছোট ঢিল দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন—জানি, ওঁর মনে কষ্ট হবে, তবু আমাকে যেতে হবে।

বুঝলাম, অন্তরে যে বেদনা চেপে রেখেছেন সেই বেদনা ভোলার জন্যই বিশেষ

ক'রে এই বিদেশ-যাত্রা। মানুষের মনে ব্যথা ও বেদনার বোঝা সর্বদা এমনই চেপে থাকে যে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

সহসা উনি ব'লে উঠলেন—রাঙা-কুঠি নেওয়ার কি ঠিক করলেন? আর ত' এলেন না আপনারা? জয়ন্তকেও দেখিনি অনেক কাল।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম—না, আমরা আর যেতে পারিনি, আপনি কি ভাড়াটে ঠিক করেন নি এখনও?

—না, আমি আপনাদের ভরসাতেই আছি।

—নিতে পারলে ত' ভালোই হ'ত।

—কেন? নিতে পারবেন না?

মনে হ'ল সত্যি আমরা কেন নিতে পারব না। এই সুযোগ সর্বদা আসে না। তা ছাড়া গোড়া থেকেই আমার মন বলছে, আমরা সেখানেই যাব। কি অদ্ভুত ব্যাপার, আমিও পোস্ট অফিসে এসেছি টাকা তুলতে আর গোবিন্দবাবু যিনি সহজে বাড়ি ছেড়ে বেরোন না এসেছেন কন্‌ভেণ্ট লেনে পিসির বাড়ি।

আবার জুতার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন—শুনুন! আমি স্পষ্ট কথা বলছি, আপনারা থাকুন, মাসিক কুড়িটা টাকা দিলেই হ'বে। আমি বেশী চাই না। বাড়ি ভাড়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই কেউ বাড়িটায় বাস করুক। জানেন ত' বাড়িতে কেউ না থাকলে সে বাড়ি পোড়োবাড়ি হয়ে দাঁড়ায়।

—কিন্তু উনি ভাববেন আপনি আমাদের ওপর অনুগ্রহ ক'রে এত কম ভাড়ায় বাড়ি দিচ্ছেন, এ সব বিষয়ে উনি বড় খুঁতখুঁতে।

—আপনার ত' ওসব কম্‌প্লেকস্ নেই? না আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

—আমার ওসব বালাই নেই। যে বাড়ি আপনি স্বচ্ছন্দে দু'শো টাকায় ভাড়া দিতে পারেন সেই বাড়ি আপনি কুড়ি টাকায় দিচ্ছেন—আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত জানি, না নেওয়াটাই বোকামি। কিন্তু—

জুতার উপর থেকে মুখ তুলে উনি আমার পানে চেয়ে বললেন—নেওয়াই উচিত, আমার ইচ্ছা আপনারাই ওখানে থাকেন।

ওঁর চোখ দুটো লক্ষ্য করলাম,—সহসা তার রঙ বদলে গেছে। আমি অন্য দিকে তাকালাম, আমার মন বলছিল—উনি যেন আমার কতদিনের চেনা, জীবনের গলিপথে এমনই দেখা হয়েছে কত শত বার।

প্রকাশ্যে বললাম—শুনুন আমি ওঁর সঙ্গে কথা ব'লে আপনাকে চিঠি দেব, আপনার কথা বলব, তা ছাড়া ও বাড়িতে আমরা যাবই।

গোবিন্দবাবু বললেন—আর একদিন এসে বাড়িটা না হয় ভালো ক'রে দেখেই যান না—

আমি মাথা নাড়লাম,—তার প্রয়োজন নেই, ঘর দোর সব আমার মুখস্থ হয়ে আছে—

উনি বললেন—জানি, আমারও বাড়িটা প্রথম দেখেই কেমন মনে হয়েছিল, আমি বুঝেছিলাম আপনারাই এবাড়ি নেবেন।

আমি শুধু বললাম—আমারও ত' তাই মনে হয়েছে—

বাড়ি ফিরে এসে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে ব'সে হাজার বার মনে হ'ল কিন্তু কি ক'রে সম্ভব হবে। ভাড়া কুড়ি টাকা বটে,—কিন্তু এক বছরের ভাড়া আগাম দিলে ভালো হয় এমনই একটা কথা রমানাথবাবুকে বলেছেন উনি,—ওঁর এই বিদেশ যাত্রার মুখে সে টাকাটা না দেওয়া ঠিক নয়, কারণ টাকাটার অঙ্ক খুব বেশী মোটা নয়, কিন্তু আমাদের হাতে এখন টাকা কোথায়!

খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় আমার অলঙ্কারের কথা মনে পড়ল, কুমারী অবস্থায় আমার যে সব অলঙ্কার ছিল তার অনেকগুলি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম,—এতদিন তার কথা মনে আসেনি।

শোবার ঘরে গিয়ে আমার স্যুটকেসটা খুললাম, কাপড়-চোপড়ের নিচে

ভেলভেটের বাক্সবন্দী জন্মদিনে পাওয়া প্লাটিনাম রিস্টওয়াচ, আঙটি, ব্রেসলেট, ব্রুচ, নেকলেস ইত্যাদির সন্ধান মিলল।

বিছানার উপর স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে সবগুলি নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম।

আমার কোনো ধারণাই ছিল না ওদের মূল্য সম্বন্ধে, তবে এটুকু জানতাম গোবিন্দবাবুকে ভাড়া দেওয়ার জন্য ওর যে কোনো একটি যথেষ্ট—বাকী যা থাকবে তা'দিয়ে অসময়ে কিছুদিন চালানো যেতে পারে।

কিন্তু কোথায় বিক্রী করব? এখন ত' আর পাড়ার স্যাকরার দোকানে ছুটতে পারি না।—তবে একজন আছে—তার কাছে সকল কথা বলা যায়।

গোলাপ হালদার! পুরাতন জীবনের এই একটি মাত্র প্রাণীকেই খুব বেশি জবাবদিহি করতে হবেনা,—গোলাপ নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা ঠিকমত করতে পারবে, আর অন্ততঃ এ কাজে বাধা দেবে না।

আবার পোস্ট অফিসে গিয়ে গোলাপকে বহুদিন পরে ফোন করলাম। ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই গোলাপ বাইরে থেকে ফিরেছে, টেলিফোন ধরেছিল সে স্বয়ং। ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যেই দেখা করার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এতদিন পরে আবার ওর সঙ্গে এভাবে দেখা করতে হবে কে জানতো।

মৌলালীর মোড়ে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল গোলাপ—আমাকে দেখেই দরজা খুলে দিয়ে বলল—উঠে পড়ো—

গোলাপ আমাকে নিয়ে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর কফি হাউসে এসে উঠলো। একটা নিরালা কোণ বেছে নিয়ে বসা হ'ল। আমার কেমন মনে হচ্ছিল যেন সহসা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, যে স্বপ্ন অতীতে বহুবার দেখেছি, আবার আজ সেই স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।

একটু ঠাণ্ডা হয়ে ওকে আমি সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম, তারপর জয়রামপুরের রাঙা-কুঠি, আর গোবিন্দবাবু এবং সবশেষে আমার ব্রুচ বিক্রীর কথা।

নিজের মুখে হাত চেপে রেখে গোলাপ বলল—লক্ষপতির সুন্দরী মেয়ে—গয়না বিক্রী করছে। বড় চালাক তুমি—না?

—নিশ্চয়ই চালাক, কেন নয় বলো? দেখো উনি সারাদিন ধরে দৈনিকের অফিসে খেটে মরছেন,—তারপর সেবা-সংঘের ব্যাপার আছে, সেই সকালে খেয়ে বেরিয়ে রাত আটটা-নটার সময় যখন ফেরেন তখন যে কত ক্লান্ত দেখায় কি বলব। তারপর খেয়ে দেয়ে আবার লিখতে বসেন। জানো সেদিন একশোটা টাকার জন্য একটা মানের বই পর্যন্ত লিখেছেন।

—রাঙা-কুঠিতে গেলে কি কাজ ছেড়ে দেবে?

—হ্যাঁ, আমার মতলব তাই, কাগজের কাজে ওঁর মন নেই এতটুকু, সম্প্রতি একটা কবিতার বই বেরিয়েছে—'কালবৈশাখী'।

—হ্যাঁ, কি একটা কাগজে রিভিয়ু দেখলাম। ভালোই লিখেছে দেখছিলুম।

—সবাই ত' ভালো বলছে। কে একজন প্রকাশক নাকি একটা উপন্যাস লিখতে বলেছেন, এখন ত' সেই কাজই করছেন,—তাই ভাবলাম ওঁকে দিয়ে এখন লেখানোই উচিত। সুটকেসের ভেতর এগুলো পড়ে থেকেই বা কি লাভ গোলাপ? ওসব ত' আর আমি পরবো না কোনোদিন, তাছাড়া এই ত সুযোগ নেওয়ার সময়—

মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে গোলাপ পকেট থেকে সিগারেট কেস বা'র ক'রে একটি সিগারেট ধরালো—তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল—হয়ত তাই, কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হয়—মুখে এসে পড়লে তবেই উনি খেতে পারেন—

আমি বললাম—এ তোমার পুরুষমনের নিছক ঈর্ষা, কিন্তু যাই হোক,—এখন ঐ 'রাঙা-কুঠি'টা আমরা নিতে চাই, সুযোগ যখন এসেছে তখন তা গ্রহণ করা উচিত। না-নেওয়াটাই বোকামি। যাই হোক ও-বাড়ি নেওয়া হোক আর নাই হোক তুমি আমার জিনিষগুলো বিক্রী ক'রে দেবে? যদি না পারো আর কাউকে ধরতে হবে—

—তুমি যে আমাকে কিছু বলার সুযোগই দিচ্ছনা, সব কথাই তুমি বলছো। আচ্ছা স্নিনতি, সবগুলো একসঙ্গে বিক্রী করতে চাও? কত টাকা তোমার এখন দরকার?

—গোবিন্দবাবুকে দিতে হবে আড়াইশো টাকা, কিছু হাতে রাখব, তারপর শীলা বলেছে ওখানকার মেয়েদেব স্কুলে একটা মাস্টারীও আমার জুটে যেতে পারে, তা হ'লেই হবে আমাদের—

এইবার গোলাপ বলল—আচ্ছা, আমার দ্বারা যতটুকু হবার তা হবে জেনে রেখো, তবে—

আমি উঠে পড়ে বললাম—তবে টবে চলবে না, সত্যি আমাকে বোকা ভেবো না, কি যে হবে তা কি বুঝছি না—

গোলাপও উঠে দাঁড়াল, ওর চোখে একটা অদ্ভুত ভংগী।

—ভালো হ'লেই ভালো।

আমি বললাম—থাক্‌গে ওসব কথা, আচ্ছা তুমি মাধুরীদের খবর রাখো, অনেকদিন মাধুরী ও অজিতের কোনো খবর জানিনি।

এইবার গোলাপ হেসে উঠলো অতি বিশ্রীভাবে—বলল, কি খবর চাও—দেশশুদ্ধ সবাই জানে, তুমি জানো না?

—অর্থাৎ?

—অজিত এখন কোলকাতায়, দিল্লী ছেড়েছে অনেক কাল। মনোহর পুকুর-টুকুরে থাকে আর শ্রীমতী মাধুরী এখন জার্মানীতে।

—বলো কি? বেশ বেশ, তা একা গেল কেন?

—ঠিক একা হয়ত নয়, সঙ্গে সেই বিমল দাশগুপ্তটিও আছেন।

—সে আবার কে?

—জানো না কিছুই দেখছি। ডাঃ অমল দাশগুপ্তের বড় ছেলে, ব্রীফ্‌লেস ব্যারিস্টার, মেম বিয়ে ক'রে এনেছিল, মেম পালিয়েছে।

—বিমল এখন মস্ত আর্ট-ক্রিটিক। দেশী, বিদেশী, সব রকম ছবি নাকি বোঝেন, মাধুরী ত' ছবি আঁকত—সেই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা, ফলে অজিত বেচারী একেবারে নক্ড্ আউট। তার তখন হাতে টাকা নেই, তাই স্ত্রীকে বেঁধে রাখতে পারল না। স্বামী-স্ত্রীতে একেবারে কোন সম্পর্ক নেই।

—শুধু টাকার লোভে স্বামিত্যাগ? তাজ্জব! ওদেরও ত' শুনেছি 'লাভ ম্যারেজ' হয়েছিল?

—আজকাল ত' সবাই 'লাভ' ক'রে বিয়ে করে, পরে সেটা লোকসানে দাঁড়ায়। মাধুরী নাকি বলেছে অজিত মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে তাকে ধ'রে দু-চার ঘা দিত।

—ছি ছি! তবে কি জানো মাধুরীটা ঐ রকমই বরাবর, মনে নেই বিয়ের আগে গৌরী গুপ্তকে নিয়ে কি কেলেংকারীই না করেছিল! থাক্গে পরচর্চায় কাজ নেই—

—বাকী বিশেষ কিছু রইলো না, আরো অনেক মুখরোচক স্ক্যাণ্ডাল আছে। তবে তোমার সময়ও নেই, শুনেও কাজ নেই। তোমাদের 'লাভ' ম্যারেজের কারবারে কোনো লোকসান করনি ত'।

আমি গোলাপের মধ্যে অতীতের সেই সারল্যের স্বর লক্ষ্য ক'রে খুসী হলাম। বললাম—এখনও হিসাব নিকাশ খতিয়ে দেখা হয়নি।

—হিসাব নিকাশের হয়ত সময় হয়নি, তোমাকে ত' কেউ আজকাল দেখতেই পায় না, একেবারে অসূর্যম্পশ্যা।

—আমি থাকি অন্য জগতে, তোমাদের সোসাইটির কাছে সেটা হয়ত আস্তাকুঁড়। কি ক'রে দেখা হবে বলো ত'! কারো সঙ্গে দেখা হয় না, এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

—তুমি দিন দিন 'স্নব' হয়ে যাচ্ছ, এও এক রকম 'স্নবারি', সমাজের একপাশে সর্বহারা সেজে থাকা।

—দেখো গোলাপ! সত্যি ত' আমরা বড়লোক নই,—দূরে থাকাই ত' ভালো। এই জন্যেই মহেশতলার 'রাঙা-কুঠি'টা আমার চাই। সহর ও সমাজ থেকে দূরে।

মহেশতলা ভবনে আমার বিয়ের দিন সকালে শেফালী আর গোলাপকে যেমনটি দেখেছিলাম সেই ছবি মনে এল। গোলাপ শেফালীর পিছনে পোষা কুকুরের মত ঘুরছিল।

গোলাপ হেসে বলল—অর্থাৎ স্বামী বেচারীকে চোখে চোখে রাখতে চাও।

আমি বললাম—হয়ত তাই।

গোলাপের স্যুটের চমৎকার কাট-ছাঁট দেখতে লাগলাম। দরজির কৃতিত্ব আছে। ওঁর খদ্দরের পাঞ্জাবী কিন্তু এর কাছে আপন মহিমায় উজ্জ্বল।

বললাম—আচ্ছা তোমার সঙ্গে অজিত ভাদুড়ীর দেখা হয়?

—হঠাৎ একদিন পথে দেখা হয়েছিল।

বাড়ি ফেরার পথে ভাবতে লাগলাম আমাদের এই পোষাকি সভ্যতা আর ভদ্রতার মুখোস কবে আমরা খুলে ফেলতে পারবো। বাইরে আমরা যতটা ভদ্র সেজে থাকি ভেতরে ততখানি অপরিচ্ছন্ন।

সেই সপ্তাহের মধ্যেই গোলাপ একদিন আমাকে একহাজার টাকা দিয়ে গেল। মাত্র একটি আংটি আর ব্রুচ বিক্রী করেই টাকাটা পাওয়া গেছে। বাকী গহনাগুলি ফেরৎ দিয়ে বল্ল, ওগুলো এখন থাক পরে অনেক কাজে লাগবে।

দু'দিন পরে গোবিন্দবাবুকে চিঠি দিলাম আমরা তাঁর অসুবিধা না হ'লে বৈশাখ থেকে রাঙা-কুঠি ভাড়া নেব, তার আগেই যদি উনি আমেরিকা চলে যান তাহ'লে যেন আমরা যাতে বাড়িটা পাই তার ব্যবস্থা ক'রে যান। সেই সঙ্গে একবছরের আগাম বাড়িভাড়াও পাঠিয়ে দিলাম।

তারপর ওঁকে জানালাম।

ষোলো

দুয়ে মিলে এক

যে-অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা উভয়ে বাঁধা ছিলাম, সেই বাঁধন সেই রাত্রিতে যেন মাকড়সার জালের মত ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম হয়ে এল।

আমি যে অলঙ্কার বিক্রী ক'রে ছ-মাসের আগাম ভাড়া দিয়ে দিয়েছি তার জন্য ওঁর তেমন মাথাব্যথা নেই, উনি চটেছেন অন্য কারণে। ওঁর ধারণা আমি জোর ক'রে এমন একটা অবস্থার মধ্যে ওঁকে টেনে নিয়ে চলেছি যা একান্ত আমারই অহমিকাকে পরিতৃপ্ত করবে।

সুদীর্ঘ তর্কাতর্কির পর আমি রেগে বললাম—পাগ্‌লামি কোরোনা, অতিশয় বোকার মত কথা বলছ, তুমি ব্যাঙ্কের কেরাণী, কিংবা খবরের কাগজের রিপোর্টার যাই হও না কেন আমার তাতে কি—আমার ইচ্ছে তুমি নির্বিঘ্নে বসে কেবল লেখাপড়া করো। আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না।

আজ মনে হয় আমি সেদিন আশাহত হয়েছিলাম—সমগ্র ব্যাপারটি কিভাবে ওঁকে জানাব, উনি কি ভাবে তা গ্রহণ করেন তা আমি অনেক আগে কল্পনা ক'রে রেখেছিলাম—উনি ডেক চেয়ারে এসে বসবেন তারপর আমি ধীরে ধীরে সকল কথা বলব,—আনন্দে অধীর হয়ে নাটকীয় ভংগীতে উনি বলবেন—মিনতি you are great! আর চাকরী নয়, এবার সাহিত্য! তারপর আমরা উভয়ে মিলে আরো দূরে চলে যাব,—ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করব, সেই সুদিনের কথা

কল্পনা করব ওঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির কথা যেদিন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সুদিনের কথা।

উনি বললেন—আমাকে এতটুকু ভাববারও সময় দিলে না তুমি। আমি এখন যেটুকু কাজ করি তার চেয়ে বেশী ত' আর পারবো না। তা ছাড়া এখানে একটা সাহিত্যিক পরিবেশ আছে। কি আছে তোমার মহেশতলায়? আমি তোমাকে আগেও বলেছি দারিদ্র্য সম্পর্কে তোমার এতটুকু আইডিয়া নেই, দারিদ্র্য যে কি বস্তু তা তুমি জানোনা,—

আমিও জবাবে বললাম—তাহ'লে এই বর্তমান অবস্থাটার নাম কি? এই যদি দারিদ্র্য না হয়—

ওঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে।

বললেন—নিশ্চয়ই নয়, আমাদের একটা বাঁধা আয় আছে,—নিয়মিত রোজগার আছে, ছবেলা ছমুঠো খেতে পাচ্ছি, অন্ততঃ এমন অবস্থা যার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো—ধরো আজ যদি মরি, কি থাকবে তোমার? আমার খবরের কাগজ এক পয়সাও দেবে না, তখন—

আমি চেঁচিয়ে বললাম—চুপ করো। কে চায় তোমার টাকা! এমনভাবে কথা বলো যেন তোমার খবরের কাগজের একশো পঁচিশ টাকা একটা বিরাট ব্যাপার। আজকের দিনে ও টাকা কিছু নয়। একটা পিয়ন পেয়াদাও ওর চেয়ে বেশী রোজগার করে। এখনও চেষ্টা করলে আমি হয়ত ওর চেয়ে অনেক বেশী পেতে পারি।—বাবা ঠিকই বলেছিলেন,—কোনো যোগ্যতা নেই তোমার, সত্যি তুমি ভণ্ড—

কথাগুলো আমি মিনতি যেন বলিনি! ভূতগ্রস্তের মতো আমার গলা থেকে বেরিয়ে এল। যেন এক অনাথার আকুল আর্তনাদ। যেন এক কুৎসিত ব্যাপিকা রমণী আঘাত করার আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে চায় আঘাতের পর আঘাত ক'রে ওঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলতে—

সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড—কথাগুলো ব'লে আমিই আবার কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

সম্রাটের মতো দীপ্ত তেজে উনি ব'লে উঠলেন—চুপ করো, যেন মেছুনীর মতো কোঁদল সুরু করেছ।

আমার অন্তরস্থিত সেই প্রেত বলে উঠল—মেছুনীর মতো আছি আর মেছুনীর মতো কথা কইতে দোষ। যাদের সঙ্গে আছি দিনরাত তাদের স্বভাব যদি পেয়ে থাকি, তাহ'লে অপরাধ কার? তুমি তবু সারাদিন অনেক উঁচু-দরের মানুষের সংস্পর্শে আসো—আর আমি আস্তাকুঁড় ঘেঁটে, নর্দমা পরিষ্কার ক'রে দিন কাটাই—কান্নায় আমার গলার স্বর আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল,—তবু আবার বললাম,—এখন এই নরক থেকে চলে যাওয়ার একটা সুযোগ এসেছে তবু তা তোমার মনঃপুত নয়। তুমি বোধ হয় চাও আমি উষাদি' ও মুদী বউএর মতো জীবনটা সহজ ক'রে নিই। তুমি আমাকে নীচে, আরো নীচে নিয়ে যেতে চাও। গোড়া থেকেই তোমার এই অভিসন্ধি ছিল। আমার সুন্দর হাত দেখে তোমার কষ্ট হয়েছিল, তাই সেই প্রথম রাতেই বলেছিলে এ হাতে হবে না।—মানুষগড়ার হাত চাই। যা কিছু তুমি হাতে করবে তাতে একটা ছাপ রাখতে চাও। ভেঙে চুরে দুমড়ে মুচড়ে তাকে একটা জড়পিণ্ড বানাতে চাও।

আমি তখন আকুল হয়ে কাঁদছি, আমার দু'চোখ বেয়ে বর্ষার নদীর মতো ধারা নেমেছে, কিন্তু তা মুছতেও পারছি না। উনি কিন্তু কিছুই দেখছেন না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখ একেবারে শাদা হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে উনি সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছু পরেই জানলাম, সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, এবং দরজা খুলে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

ঠিক ঐ জাতের মানুষের মতোই কাজ,—কোনো জবাব দেওয়ার নেই, তাই এই ঝিরে ঝিরে বৃষ্টিতে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বাবা ঠিকই বলেছিলেন। ভীরু, নির্বোধ, ভণ্ডের হাতে আমি না ভেবে চিন্তে এক মুহূর্তের ঝোঁকে জীবন সঁপে দিয়ে বসে আছি। কল্পনার পক্ষিরাজে যারা উড়ে

বেড়ায়, মধুর মিথ্যায় মানুষকে, বিশেষ ক'রে আমার মত মেয়েমানুষকে ভোলানো তার পক্ষে এমন কি বেশী কাণ্ড!

এই হ'ল বাঁচার মত-বাঁচা, 'উদ্দেশ্যময় জীবন', 'জীবনের অভিব্যক্তি'। যত সব বড় বড় গালভরা কথা।—ওসব কথার কোনো মানে নেই,—কথার বেপারী, কথা আর কথা—

এর কোনো দাম নেই। সেই মুহূর্তে, আমার সেই তীব্র রাগের মুহূর্তেও আমি জানতাম আমি মিছে বল্‌ছি, কেন বল্‌ছি তার কারণও আমার অজানা নেই। লোকটা যদি না ভণ্ড হ'ত তাহ'লে আমার কথার জবাব দিতে হ'ত। খাঁটি লোক হ'লে আমার কথা সহ্য করত না, আমি যে সব কথা বলেছি মুখ বুজিয়ে তা সহ্য করত না।

সত্যি উনি মুখ খোলেন নি।

হয়ত দুর্বলতা নয়, ওঁর অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই উনি সেই রাতে অটল, অচল ছিলেন—সব কথা চুপ ক'রে শুনেছিলেন। হয়ত ত্রুটী হয়েছিল আমার নিজেরই, আমারই পরাজয় ঘটেছিল, বুঝিনি ওঁর প্রেমের গভীরতা!

কতক্ষণ যে কেঁদেছিলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তা জানি না, অনেক পরে উঠে ব'সে রাতের রান্নায় বসলাম। কয়লার তোলা উনুনে ভাঙা পাখা দিয়ে হাওয়া ক'রে আঁচ তুল্লাম।—উনানের আঁচ ক্রমে লাল হয়ে উঠলো।

আমার রাগটা পড়ে আসছিল—মাথাটা হালকা হয়েছে। আমি যে রেগে ছিলাম তাতে আর সন্দেহ নেই। ওঁকে অনেক কটু কথা বলেছি।

অন্যায় বলেছি সত্যি।—কিন্তু ঐখানেই কি পৃথিবীর শেষ? প্রতিদিনের জীবনে আছে অনেক মান-অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি ও কলহ—কিন্তু আবার মানুষ তা কাটিয়ে উঠে, নতুন আশায় বুক বাঁধে।

উনি বাড়ি ফিরে এলে সব কথা ওঁকে বুঝিয়ে বলতে পারব। আমার মনে কত আঘাত লেগেছে যার ফলে আমার মুখ দিয়ে উঠেছে ঐ হলাহল। আমার সারা অঙ্গ সেই বিষে বিষিয়ে উঠেছিল—

আমি অবসন্ন, ক্লান্ত হয়ে সেই ক্যান্‌ভাসের শূন্য ডেকচেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

চতুর্দিক স্তব্ধ। ঘণ্টা দুই আগে উষাদি' পঞ্চাননতলায় কথকতা শুনতে গেছেন,—নীচের তলার বৌটি ন'টার ভিতর কাজকর্ম সেরে শুয়ে পড়ে, শশীবাবু সাড়ে সাতটায় বেরিয়ে যান। অতি ভোরে উঠে বৌটিকে রান্না চাপাতে হয়।

শুধু বৃষ্টির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটা ভাঙা নল দিয়ে জল এসে নীচের কলতলার টিনের চালে পড়ে বেশ আওয়াজ হচ্ছে।

সহসা সিনেমার পর্দায় দেখা ছবির মতো আমাদের দাম্পত্যকলহের দৃশ্য যেন আমার চোখের ওপর ঘটছে দেখতে পেলাম। আমি একজন অনিচ্ছুক দর্শক, আমাকে ধ'রে বেঁধে সব দেখানো হচ্ছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে নিতে চাই, ওই ক্ষিপ্ত মুখ আর দেখতে চাই না, সেই বিষ-মাখানো কথা আর শুনতে চাই না, তবু —গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো কানে বাজে—

"যা কিছু হাতে করবে সেটা দুমড়ে নষ্ট করবে।"

"গোড়া থেকেই তোমার লক্ষ্য আমার এই হাতে, হাতের সৌন্দর্য তোমার সয় না।"

"তুমি আমাকে অনেক নীচে নামিয়েছ।"

"বাবা, ঠিকই বলেছিলেন, তোমার কোনো ক্ষমতাই নেই।"

তখন অথচ কিছুতেই মনে হয়নি ওঁকে অপমান করছি, নিদারুণ অপমান।

কিন্তু কেন এমন হ'ল? কেন আমি ওসব বললাম?

বাবাকে বা যাঁদের সব আমি জানতাম—তাঁরা কেউ-ই কাউকে নীচে নামাবার লোক নয়। তা আমি জানতাম। কিন্তু উনিই ত বলেছিলেন "He who binds himself to a joy, does the winged life destroy—" ছেড়ে দাও ধরে রেখোনা,—নইলে তোমার মুঠিতে কিছুই ধরতে পারবে না।

স্বাধীনতা—অপরের মতবাদের চাপে যে জীবন আচ্ছন্ন নয়—সেই জীবনকে প্রকাশের স্বাধীনতা—জীবনের পরিপূর্ণ স্রোতকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা—ফুল

যেমন চিরন্তন উৎস থেকে পায় ফুটে ওঠার প্রেরণা। সেই স্বাধীনতা চাই জীবনে —বন্ধনহীন মুক্তি।

কি সেই বস্তু যার তাড়নায় আমি হঠাৎ অত কুৎসিত আক্রমণ ক'রে বসলাম। আমার অলঙ্কার বিক্রী করার সঙ্গে ত এর এতটুকু যোগ নেই। 'রাঙা-কুঠি' নেওয়ার সঙ্গেও যোগ নেই। আমাদের সামনে যে সহস্র সমস্যা ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গেই বা সংযোগ কোথায়?

এ যেন আমারই ব্যঙ্গচিত্র, আমার প্রকৃত আকৃতির সঙ্গে যার কোনো মিল নেই, সেই মূর্তি আমার কণ্ঠ নিয়ে এতক্ষণ বিষোদ্গার করেছে।

আগেকার কালে বলত 'ভূতে পাওয়া—', কথাটা মিথ্যা নয়, ঐ সময়টুকু আমিও যেন—ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি ওঁকে যা বলেছি তা সেই প্রেতেরই উক্তি, উনি ন'ন আমিই ধ্বংস করতে বসেছি আমাদের পবিত্র প্রেম। আর কারণটা কি না আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে উনি কথা বলেছেন, ওঁর নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন ব'লে আমি ওঁকে এতখানি উৎপীড়ন করলাম।

এই আমার প্রেম? এই আমার সংস্কৃতি? এই আমার বহুমূল্য শিক্ষার দাম, আমাদের সামাজিক সভ্যতার পরিচয়? সত্যি কি ক'রে আমি 'মেছুনীর' মতো ব্যবহার করলাম!

আমিও জনতার একজন—নিওন আলো, টেলিভিসন, এক্স রে, বিমানের গতি এটলান্টিককে ছোট্ট নদীর মতো হ্রস্ব ক'রে এনেছে, এটম বোম এক সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড দেশ উড়িয়ে ছিল, ইঞ্জিনিয়াররা বড় বড় পাহাড় অবলীলাক্রমে কাটছেন, মানুষ নামছে সমুদ্রের অতলে, উঠছে পাহাড়ের শীর্ষে, অথচ আত্ম-সংযম এক অজানা বিদ্যা।

উনানের আঁচ পড়ে আসছিল—আবার উঠলাম, সামান্য কয়লা দিয়ে ভাতের হাঁড়ি চাপালাম! বাইরে ঘন অন্ধকার। বৃষ্টি পড়ছে। সহসা বুঝলাম এই বিরাট বাড়িতে আমি এই মুহূর্তে একা বসে আছি। কার যেন উপস্থিতি অনুভব

করলাম—অন্ধকার চিরে একটা কুৎসিত-দর্শন প্রাণী আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমি তার এই বীভৎস রূপ সইতে পারছি না, সেই ছোট্ট রান্নাঘর—সেই অন্ধকার সবই আমার অতি বিশ্রী লাগল।

ঘড়িতে ন'টা বাজলো। এত রাত হয়েছে বুঝিনি—ডেকচেয়ারেই শুয়েছিলাম প্রায় একঘণ্টা। আমার মেজাজের হিসাব-নিকাশ করেছি শুয়ে শুয়ে। ওঁর সেই শাদা মুখখানি যতবার আমার মনে ভেসে এসেছে ততবার মনে হয়েছে আমার বুকের ভিতর একটা অদৃশ্য যন্ত্র যেন আমাকে পিষে মারছে, কি তীব্র তার যন্ত্রণা! কি ভয়ংকর বেদনা তা প্রকাশ করা যায় না।

তাঁকে আবার দেখার জন্য, তাঁর দেহস্পর্শ করার জন্য, সকল কথা বুঝিয়ে ব'লে ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমার মন উন্মুখ হয়ে রইল।

নীচে দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল,—তারপর পায়ের আওয়াজ, বুঝলাম উষাদি'র পঞ্চাননতলার কথকতা শেষ হ'ল।

নিঃসঙ্গতা এতক্ষণে একটা জীবন্ত আকৃতি নিয়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কাঁধের ওপর তার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস এসে পড়ছে।

ভিক্টোরীয় যুগের নায়িকার মত আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমি বার বার কাঁধের ওপর থেকে সেই অদৃশ্য শত্রুকে সরাবার চেষ্টা করলাম।

আমিও দেখছি ওঁর মত কল্পনা-বিলাসী হয়ে উঠেছি। কি এসে যায় চতুর্দিক যদি এমনই অন্ধকারে ভরে যায়? তার সেই রূপের মধ্যেও কি মিলবে না নিবিড় আনন্দ?

কিসের আমার এই আতংক? আমি ত' আর সত্যি ওঁকে হত্যা করিনি যে এইভাবে শংকিত হয়ে এত নিদারুণ অন্তর্জ্বালা ভোগ করব? কিসের আমার ভয়?

ভাতের হাঁড়ির ঢাকা ছাপিয়ে ফেন পড়ছে, উনুন নিভে যাওয়ার যোগাড়। তাড়াতাড়ি গিয়ে তার ঢাকাটা খুলে নিয়ে একটু জল ঢেলে দিলাম, তারপর সযত্নে

ফেন গালতে বসলাম। জীবনে কোনোদিন ভাবিনি ভাতের হাঁড়ি উলটিয়ে এই ফেন গালার আর্টে আমাকে এমন অভ্যস্ত হতে হবে।

কিন্তু এ আমার কি হোল, খুন করার চাইতেও খারাপ অবস্থায় পড়েছি। আমি স্পষ্টই দেখলাম আমার সেই কটু উক্তি ওঁর মনে বার বার এসে আঘাত দিচ্ছে। আমার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে তারা আর কোনো বাধাই মানছে না।

বাহ্যতঃ এর কোনো প্রকাশ নেই, কেউ জানবে না, কেউ শোনে নি কোনো কথা, কিন্তু ওঁর মন থেকে এই কথা কোনোদিন মুছবে না। কিছুতেই আর সেই কথাকে ফিরিয়ে আনতে পারবো না।

এলুমিনিয়মের চায়ের কেটলি উনানে বসিয়ে আবার সেই ডেকচেয়ারে এসে বসলাম। যত সময় কাটে, আমার জ্বালা ততই বেড়ে চলে,—বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ, কেট্‌লির জল ফুটছে সে আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

আমি অমনই শুয়েছিলাম, উনি ঘরে এলেন।

সেই দীর্ঘ রুক্ষ কেশ বেয়ে জল ঝরছে, গায়ের গেরুয়া রঙের জামাটার অনেক জায়গায় জলের দাগ।

আমি বললাম—ভিজে গেছ একেবারে।

মাথা নাড়লেন মাত্র।

আবাব বললাম—এখনও বৃষ্টি পডছে ?

—হ্যাঁ।

বললাম—আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়ে মাথাটা মুছে নাও। উনানে কেটলি বসানো আছে আমি বরং আদা দিয়ে একটু চা ক'রে আনি।

উনি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন—দেখো মিনতি, ভাবছিলাম—

আমি বললাম—জলটা ফুটছে, ঢাকনার আওয়াজ পাচ্ছ না?

আসল কথা, এখন আমি ওঁর মুখে কোনো কথা শুনতে চাই না। কিন্তু উনি নাছোড়বান্দা।

বললেন—শোনো মিনতি! আমাদের এখনও হিসাব-নিকাশের সময় আছে। তুমি ফিরে যেতে চাও?

—তার মানে?

ঘরের দেয়ালগুলো ওয়ালট্ ডিসনের কার্টুনের মতো যেন আমার ঘাড়ে এসে পড়ল।

—হ্যাঁ, তোমার মা-বাবার কাছে?

আমি কোনও জবাব দিতে পারলাম না—আমি নির্বোধের মতো সেই ভাবে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থই নেই, আমার কাছে এখন সে দরজা বন্ধ। কোনো দিন একথা মনে হয়নি। এই ঝুলভর্তি রান্নাঘর,—ঐ কলতলা, নোংরা নর্দমা, এলুমিনিয়মের কেটলির ঢাকা নড়ছে আর সামনে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, মাথা বেয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ছে—এই একমাত্র বাস্তবতা আমার কাছে,—এর চেয়ে পরম সত্য আর কি আছে?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মহর্ষিদেব যখন জানতে চেয়েছিলেন পাহাড়ে বেড়াতে যেতে চাই কি না, তখন যদি আকাশ-ভাঙা চীৎকার ক'রে বলতে পারতাম, হ্যাঁ চাই, তাহ'লেও আমার কিছু বলা হ'ত না।'

আমারও মনে হয়ত সেই ভাব জেগেছিল, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলাম—না!

উনি এক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কাছে এসে আমার কোলে মাথাটি রেখে ব'সে পড়লেন। আমি সযত্নে ভিজে চুলগুলি আমার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিলাম।

—তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করছ, আর আমি তোমাকে ছোটলোকের মত কত কটুকথা বললাম।

—ছি-ছি, তুমি ত' কিছু বলোনি—

কিন্তু আমি যা বলেছি সে আমার মনের কথা নয়। আমি বলিনি—

তিনি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন—থামো, তোমাকে শুনতেই হবে। আমি বাইরে গিয়ে ভালো করেছি, পথে বেরিয়ে আমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেল,—প্রথমটা আত্মসমর্থনের চেষ্টা করেছি, কিন্তু পরে দেখলাম দোষ আমারই, এতে আমার কি স্বার্থ : হঠাৎ রমানাথদার কথা মনে পড়ল—

—এর সঙ্গে তাঁর আবার কি যোগাযোগ ?

—যোগাযোগ নেই, কিন্তু যে সপ্তাহে আমরা 'রাঙা-কুঠি' দেখতে যাই, উনি বলেছিলেন 'ঠিক যে মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন, সেই মুহূর্তেই সেই বস্তুর কাছে আমরা গিয়ে পড়ি। ও বিষয়ে হঠাৎ ব'লে কিছু নেই। এই নিয়ম।'

তা ছাড়া রমানাথদা আর একটি কথা বলেছিলেন, সেটি মনে রাখার মত, তিনি বলেছিলেন—'সব বিষয়ে খোলা মন রেখো জয়ন্ত, তা নইলেই দেখবে সব দরজা তোমার কাছে বন্ধ হয়ে গেছে।'

এই বলে উনি একটু হাসলেন,—দেখছ না, আমিও তাই ক'রে বসেছিলাম। কথাটা তোমার মুখ থেকে এসেছে তাই আমি শুনতে চাইনি, অথচ আমাদের শাস্ত্রে বলে অর্ধাঙ্গিনী, আমাতে আর তোমাতে প্রভেদ কোথায় ? সত্যিই ত' তুমি অর্ধাঙ্গিনী, তুমি যা ঠিক করেছ তাতে বাধা দেওয়া আমার সাজে না। দুয়ে মিলে আমরা এক।

—যখন তোমার মুখ থেকে কথাটা এল আমি ক্ষেপে গেলাম,—কারণ আমি চাই সব কিছু আমার মনের মতো হোক। একটা কিছু ক'রে কৃতিত্ব নিতে চাই,—আমিই করেছি ওটা ব'লে জাহির করতে চাই, এর নামই অহমিকা। আমার অত কথার মধ্যে তোমাকে ভালো কথা বলিনি এতটুকু—

—যাকগে, অন্যায় আমি কম করিনি, তুমি আমার অনেক আদরের জিনিষ, তোমাকে অনাদর করা আমার সাজে না। কিন্তু তোমার কথার অর্থ কি—আমরা কি তাহ'লে যাব নাকি রাঙা-কুঠিতে ? সত্যি !

আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, উনি কি বলছেন বুঝতে পারছিলাম না। উনি মাথা নাড়লেন।

—হ্যাঁ,—যাওয়া হবেই। তবে কলকাতার কাজ শীগ্‌গীর ছাড়া হবে না। কিন্তু সে কথা যাক্, এখন কিছু খেতে দাও' বড় ক্ষিধে পেয়েছে—

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললাম—কিন্তু টাকার কথা ভেবেছ?

—ভেবেছি। প্রথমটা ভয় পেয়েছিলাম! এখন আমার ভয় কেটে গেছে।

আমি ওঁর বুকে লুটিয়ে পড়লাম, কান্নায় আমার কণ্ঠ-অবরুদ্ধ।

অনেক পরে বললাম—দেখো আমি যা বলেছি তাতে দোষ ধরো না, আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিলো।

—ভূতটা এখন কোথায়?

—সে এখন পালিয়েছে।

—সবই ছায়া, মিথ্যা—এই সত্য! এই ব'লে আমার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে ধরলেন।

সাতই বৈশাখের ভিতর রাঙা-কুঠিতে যাওয়ার কথা ঠিক হয়ে গেল।

এইসব ঠিক হওয়ার এক সপ্তাহ পরে আমার জীবনে নতুন প্রাণের জোয়ার জাগলো।

সতেরো

সোনা রঙের দিন

১৩৫৪ সালের বৈশাখ মাসে আমাদের 'রাঙা-কুঠি' আসা একবছর পূর্ণ হ'ল। জয়তী তখন মাত্র ছ মাসের। ওঁর নামের আদ্যক্ষর আর আমার নামের শেষ অক্ষর নিয়ে মেয়ের নামকরণ করা হয়েছিল।

সে এক অপূর্ব সময় কেটেছে আমাদের, রাঙা-কুঠির প্রতিখণ্ড ইট, ঘাসের প্রতিটি কণা,—আকাশ বাতাস সবই মধুর হয়ে উঠেছে। এর কাছে বেকবাগানের ফ্ল্যাটবাড়ি যেন একটা দুঃস্বপ্ন।

নিঃসঙ্গতার অন্ধকারও উজ্জ্বল সূর্যালোকে কোথায় মিলিয়ে গেছে। কাছাকাছি মহেশতলাভবন, সেখান থেকে শেফালী বা শীলা কেউ না কেউ আসতেন। আমাদের রাঙা-কুঠি মুখর হয়ে উঠত।

প্রথম বসন্ত দিনের মাধুরী অবিস্মরণীয়। বড় বড় জানলা খুলে দিয়ে শোয়া, ভোর না হতেই বিছানা ছেড়ে ওঠা, পল্লী প্রভাতের সেই শীতল হাওয়া, বাতাসের সুমধুর গন্ধ আর কলকারখানার ভেঁপুর বদলে অসংখ্য পাখির গান, সে কি ভোলবার! মানুষের হাতে পড়ে যে-প্রাকৃতিক জগতের কোনো বিকৃতি ঘটেনি— এ সেই জগৎ—

সেই বছর গ্রীষ্মকালে কয়েক দিন আমরা ছাদেও শুয়েছি। এই প্রথম মাথার ওপর শুধু আকাশের চাঁদোয়া খাটিয়ে ঘুমোলাম। পাশেই উনি থাকতেন, হাত

বাড়ালেই তাঁর দেহের শীতল স্পর্শটুকুর রোমাঞ্চ পেতাম। সে এক সোনার রঙের দিন।

আমরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলাম,—টিলের ছাদের ধারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ছোট্ট ঘরটিতে ওঁর লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, যাতে উনি নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা, নইলে অন্য ব্যবস্থাও করতে পারতাম।

লেখকরা মেজাজী, খামখেয়ালি, অব্যবস্থিতচিত্ত প্রাণী এই আমার ধারণা ছিল—কিন্তু যদিও এমন সময় গেছে যখন দিনের শেষে ক্লান্ত ও বিপন্ন হয়ে উনি দু' তিন ঘণ্টার চেষ্টাতেও দুটি লাইনও রচনা করতে পারেন নি—তবু কোনোদিন তার জন্য ভাবাবেশে নিজের অক্ষমতার জন্য আমাকে দায়ী করেন নি।

রান্নাঘরে আমার নিজের হাতে বসানো ক্ষেতের আলু ছাড়াতে ছাড়াতে, কিংবা বরবটি বা ঢ্যাঁড়স কুটতে বসে অনেক সময় ওঁর কথা ভেবেছি। বেশ বুঝছি সাপের খোলস বদলের মতো উনিও অনেক বদলেছেন, ওঁর প্রাণে এসেছে নতুন উৎসাহ, নতুন প্রেরণা। এখনও 'নবভারত' ছাড়া হয়নি, কারণ তাঁরা সম্প্রতি সংবাদ-বিভাগ থেকে ওঁকে সম্পাদকীয় বিভাগে গ্রহণ করেছেন, এবং আজকাল মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ এবং মন্তব্যাদিও লিখছেন। এই কাজটা নাকি ওঁর মনোমত হয়েছে। এর ফলে অন্যদিকেও ওঁর লেখার হাত খুলে গেছে। একদিন রমানাথদা সম্পর্কে উনি বলেছিলেন,—রমাদা চৌকস মানুষ—আমরা সবাই একপেশে।

এখন লক্ষ্য করেছি উনিও চৌকস হয়ে উঠছেন। অন্য সব দলবল ছেড়ে আজ গান্ধী সেবা-সংঘে যোগ দিয়েছেন। প্রতি শনি ও রবিবার সেই সংক্রান্ত কাজেই ব্যস্ত থাকেন।

বিশেষ কাজকর্ম ছিল না আমার, দিন কাটানো দায়। শীলা আর শেফালী আমাকে জোর ক'রে ক্ষেত-খামারের কাজে নামিয়ে দিল। ঠিকা মজুরের সঙ্গে আমিও লেগে থাকতাম। অনেকখানি সময় এইভাবে মাঠে কাটিয়ে দিতাম।

উনি কিন্তু পিতৃত্বের গাম্ভীর্য নিয়ে আমার এসব করা উচিত কি অনুচিত এই তর্ক করতেন। একদিন বৃদ্ধ অক্ষয় ডাক্তারকে ডাকাও হ'ল। তিনি তাঁর চশমা জোড়া কপালে তুলে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ দেখে বললেন—বাচ্চা আমার মা ঠাকুরুণের হবে, তোমার ত' নয়—তুমি বাপু চুপ ক'রে থাক।

কাজেই ওঁকে হার মানতে হয়। ডাক্তার বাবু বললেন—খাটা-খাটুনি করাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজন।

আমার প্রতিটি মুহূর্ত খুব ভালোলাগত। রাতে খাওয়ার সময় ওঁর কাছে প্রতিদিনকার হিসাব-নিকাশ পেশ কবা হ'ত। উনি তাই নিয়ে অনেক হাসি-তামাসাও করতেন। সেই সময় আমার বেকবাগানের ফ্ল্যাটবাড়ির কথা মনে পড়ত, কি বিশ্রী বিরক্তিকর দিনই না কাটিয়েছি, এখন ভাবি কি ক'রে সে সব আমার সয়েছে।

অনেক সন্ধ্যা রমানাথদা, সোমনাথ, শেফালী কিংবা শীলা সবাই এসে হৈ হৈ ক'রে কাটিয়ে দিত। রাজনীতি থেকে পরচর্চা চলত। এমন কি আইনের চুলচেরা তর্কও কোনো কোনো দিন সুরু হ'ত।

আমি এক কোণে বসে অনাগত প্রাণীটির জন্য জামা তৈরী করতাম আর ওদের তর্কবিতর্ক শুনতাম। কখনো ভাবতাম কি ওঁদের পাণ্ডিত্যের পরিধি,—আবার কখনও ভাবতাম সব জিনিষ এই ভাবে পাণ্ডিত্যের নিরিখে বিচার না করলে আরো সহজে অনেক সরলভাবে তার মীমাংসা হয়ত সম্ভব হ'ত।

অনেক সময় কাজ ফেলে রেখে ওঁদের আলোচনা শুনতাম, মনে হ'ত একটা বিরাট আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

সামনে একটা নতুন জগৎ, যে জগৎ নতুনরূপ নিয়ে গড়ে উঠছে আমার স্বামীর মত। পরিচিত আকৃতির সঙ্গে তার কোথাও এতটুকু মিল নেই, তার প্রকৃতিতেও প্রভেদ আছে।

পূজোর সময় ওঁর প্রথম উপন্যাস "অকাল-বোধন" লেখা শেষ হ'ল। 'হরবোলা প্রকাশিকা' বইটি ছাপতে রাজী হয়ে গেলেন।

তিনি নাকি বইটি ভালো কাটলে দু-চার মাস পরে একটি কবিতার বইও ছেপে দেবেন।

সেদিন বারোই নভেম্বর, প্রকাশক যোগজীবন বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে উনি যখন বাড়ি ফিরলেন, দেখলে মনে হবে যেন একটা রাজত্ব জয় হয়েছে।

এর দু'দিন পরেই জয়তী ভূমিষ্ঠ হোল।

স্থির হয়েছিল মহেশতলা ভবনেই প্রসবের ব্যবস্থা হবে। কারণ এখানে দেখা-শোনা করবে কে! মালতী মাসিমা গোড়া থেকেই আমাকে শীলা ও শেফালীর আর একটি বোনের মতোই দেখছেন। তিনি আমাকে চোখের ওপর রাখতে চান।

তেরই নভেম্বর একটি সাইকেল রিকসা ডেকে আনা হ'ল, এই অঞ্চলে ওর বেশী আর কিছু নেই। সকাল তখন সাতটা, তার অনেক আগেই ব্যথা উঠেছে, কিন্তু অত সকালে কাউকে ব্যস্ত করতে চাইনি ব'লে চেপে রেখেছিলাম, উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝেছিলেন। তাই আমার কোনো আপত্তি কানে না তুলে রিক্সা ডেকে এনেছিলেন।

পথে যেতে যেতে বলেছিলেম—গেল বছর এমন সময় আমরা উষাদি'র ফ্ল্যাটবাড়িতে, শীতকাল হ'লেও কি বৃষ্টিই না হয়েছিল এই সময়। উষাদি'র গজগজানিতে তুমি কি চটেই না যেতে—

উনি আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন।

বললেন—বাড়িটা তোমার ভারী খারাপ লাগত, তা আমি জানি।

বললাম—তখন তাই মনে হ'ত, এখন আর তা মনে হয় না। আমি এখন সে সব হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারি। এখনও সেই নীচের তলার ভাড়াটেরা আছে কি না কে জানে।

উষাদি' ও নীচের তলার দিদিকে আমার বিশেষ ক'রে মনে হ'ল। কিন্তু ক্রমশঃই ওদের কথা মন থেকে মুছে গিয়ে নবীন অতিথির কথায় আমার মন ভ'রে উঠল।

একদিন সন্ধ্যায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বাড়িতে এক পার্টিতে এসেছিলাম আর আজ সেই বাড়িতেই আমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে চলেছে এর চেয়ে আর আশ্চর্য কি আছে। সম্পূর্ণ নতুন মানুষ, কোনোদিন তার মতো আর কেউ ছিল না। নতুন ইতিহাস রচনা করবে এই অনাগত শিশু। মহামারী আর যুদ্ধ শেষে যার জন্ম সে কি আনবে এই অশান্ত সংসারে অপরিসীম শান্তি? কে জানে?

আমার মনের কথা ওঁকে জানালাম, বললাম—দেখ, আমার কিন্তু ভয় করছে।

উনি হেসে বললেন—ভয়ের কিছু নেই, আপনাতে আপনি কেউ-ই ফুটে ওঠে না, ওঠে কি? আজ যে বর্তমান কালের মাঝে আমরা দাঁড়িয়ে আমাদের পূর্বগামীরা কি তার স্পর্শ পেয়েছেন, নবজাতকও এমন একটা ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করবে যার সন্ধান আমরা পাইনি। সে ভবিষ্যৎ আমাদের কল্পনার বাইরে—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জানো মিনতি, সে দিন এমনই ইন্দ্রজালের দিন যে আমাদের চোখে তা স্বপ্নের জগৎ ব'লে মনে হবে।

আমি বললাম—জানি,—তোমরা মাঝে মাঝে বসে যখন তর্ক চালাতে তখন আমার এই কথা মনে হয়েছে, তাইত আমার ভয় করে।

—ভয় কোরো না। আমরা এক বিরাট পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, সে পরিবর্তন কল্যাণকর ব'লেই মনে হয়।

—না-না—।

—সত্যি সেদিনের ছোঁয়া লেগে যা কিছু অশুভ শুভ হয়ে উঠবে—অমঙ্গল মঙ্গলময় হয়ে যাবে। গান্ধীজীর দিকে চেয়ে দেখ, কি বিরাট শক্তি! আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য আপনাকে সঁপে দিয়েছেন তিনি। সেই "The Kingdom,

the power and the glory—" আকাশের এক কোণে আটকে থাকবে না। গান্ধীজী সেই Kingdom এই মাটির সংসারেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে জগৎ সংসারে এক বিরাট বিপ্লব আনবেন! তুমি আমি না জানলেও, তার কাজ অনেক আগেই সুরু হয়েছে, এতদিনে তার উদ্‌যাপন। শুধু চোখ খুলে দেখতে হবে।

—তোমার চোখ খুলেছে। তুমি আর রমানাথদা' দেখছ, আমরা আর দেখছি কই? মানুষে মানুষে কাটাকাটি হানাহানি কি কমেছে? অহিংসার 'অ' বাদ দিয়ে আর সবটুকু দেখেছি। এই মুহূর্তেই হয়ত কোনো বিজ্ঞানবীর তাঁর ভয়ংকর মারণাস্ত্রের কাজ শেষ ক'রে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

—জানি, কিন্তু ওর উপরও আরো কিছু আছে, যার সন্ধান এই খুনী বৈজ্ঞানিকদল ও যুদ্ধবাজ মানুষ এখনও পায়নি। কিন্তু গান্ধীজীর মতো মানুষ সেই শ্রেষ্ঠশক্তির সন্ধান পেয়েছেন। যেমন পেয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

ব্যথা ও বেদনায় আমার পক্ষে কোনো জবাব দেওয়া শক্ত হয়ে উঠেছিল। ওঁর মুখের দিকে তাকালাম, সে মুখে গভীর বেদনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উনি আবার বললেন—তুমিও ত' সেই মহাশক্তির পরিচয়।

সবিস্ময়ে বললাম—আমি? অর্থাৎ?

—হ্যাঁ—গো তুমি। মৃত্যুর সংসারে তুমি ত' আনছ নবজীবন, নয়? জীবনেই ত' মৃত্যুর পরাজয়।

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—হয়ত তাই।

রিক্সা মোড়ের বাঁকে ঘুরল।

আমি শুধু বললাম—ভালো পাগলকেই বিয়ে করেছি,—সব কবিরাই পাগল। আমি মরছি, এখন তুমি জীবন-মৃত্যুর রহস্য বোঝাতে বসলে। নতুন জগৎ, নব জীবন, মহাশক্তি ও-সব তোমাদের কাব্য-লোকের কথা।

উনি মৃদু হেসে শুধু বললেন—ব্যথাটা খুব বেড়েছে না? পোড়া দেশে ট্যাক্সিও নেই।

আঠারো

দিব্য জীবন

এরই প্রায় আটঘণ্টা পরে জয়তী ভূমিষ্ঠ হ'ল। সে এক বেয়াড়া অভিজ্ঞতা, অবশ্য শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার পরিপুষ্টির জন্য জননীকে অনেক কিছুই করতে হয় স্বীকার করি, যতক্ষণ না সে আত্ম-সচেতন ততক্ষণ জননীর দায়িত্ব। তবে সন্তান-জন্মের পদ্ধতি অতখানি অন্তরঙ্গ না হলেই ভালো হ'ত। মাঝে মাঝে ভাবতাম উষ্ণ একটি নীড়, আর চার-পাঁচটি ডিম, পক্ষিমাতা নিশ্চয়ই পরমানন্দে দিন কাটায়। উনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন—সবটাই শুধু দুধ আর মধু নয়, একবার ভেবে দেখ ন' মাস ধ'রে চুপ ক'রে ব'সে তা দেওয়া, একেবারে 'নট্ নড়ন চড়ন নট্ কিচ্ছু'—তবে ডিম ফুটবে। মানুষের সাধ্য নয় অতখানি কৃচ্ছ্র সাধন করা। স্নান নেই, কাপড় ছাড়া নেই, চুপ চাপ বসে থাকো—হাত-পায়ে খিল ধ'রে যাবে।

যাই হোক, সব যখন শেষ হ'ল আমি যেন ঘুম ভেঙে উঠলাম। যা কিছু ছিল কুয়াশায় ঘেরা, তা আকার নিয়ে নব জীবনের ছন্দে ফুটে উঠল। শেফালী-দের বাগানের ফোটা ফুলের গন্ধ, বাড়ির অস্পষ্ট কলরব, আর সর্বোপরি সুতীব্র যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যেন নতুন ক'রে আবার বেঁচে উঠলাম। মনে পড়ে হাসি পেল, উনি একদিন ভারতচন্দ্র পড়ে শুনিয়েছিলেন—'প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে—', আমিও সেই অসংখ্য নারীবাহিনীর একজন! জয়তীর

মুখ দেখার আগেই, আমার সঙ্গে তার কচিমুখের ছোঁয়া লাগার আগেই আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম জীবনের একটা উদ্দাম বন্যার সামনে এসে পড়েছি, শুনছি তার কল্লোল। আজ তাই মহত্তর জীবনের স্বাদ আমার প্রাণে লেগেছে।

মহেশতলা ভবন আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, কিন্তু বিশেষ ক'রে এই কটি দিনের স্মৃতি আমার কাছে অনন্ত সম্পদ। উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাত, খোলা জানলা দিয়ে ভেসে-আসা সূর্যালোক, বিকাল পাঁচটা না বাজতেই আকাশ থেকে নেমে আসত শীতের অন্ধকার রাত, গাছের পাতায় টুপ্ টাপ্ শিশিরের আওয়াজ—সেই নির্জন অঞ্চলে সত্যই বিধাতার পদধ্বনি বলে মনে হ'ত।

বাড়িব সবাই পালা ক'রে আমাকে দেখত, বুড়ো বৃন্দাবন ত' একে ধমকে ওকে বকে বাড়ি মাথায় ক'রে তুলেছে, সেই যেন বাড়ির মালিক, জয়তীর এতটুকু কাঁদবার জো নেই, বৃন্দাবন যেখানেই থাকুক ছুটে আসছে তাড়াতাড়ি, কি অসুবিধে বিশবার খোঁজ করছে,—তার চোখ আর কানকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই।

সেই দিনগুলির কথা, সেই সময়কার শান্ত সুন্দর মুহূর্ত আমার জীবনের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। সেই শান্ত পরিবেশের এতটুকু'ও বিরক্তিকর ছিল না,—মনে হ'ত যেন প্রাণরসে উচ্ছল এ এক অপরূপ অভিজ্ঞতা।

রমানাথদা' একদিন রাতে আমার ঘরে এলেন। আমি কেমন আছি এবং আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না দেখাটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। দু' একটা কথার পর হঠাৎ বললাম—আচ্ছা রমাদা', উনি বলছিলেন একদিন, আপনি নাকি বেঁচে থাকার রহস্য জানেন? মানে কি ক'রে বাঁচতে হয়?

রমাদা' জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলেন, টেবলের ওপর রাখা একখানি বইএর পাতা উলটিয়ে দেখছিলেন, আমার এই প্রশ্ন শুনে ব'লে উঠলেন—জয়ন্ত'র সব কথাই কি তুমি গোগ্রাসে গিলে ফেল নাকি?

আমি হেসে বললাম—প্রায় সবই, কিন্তু আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন আমার প্রশ্নটা, বলুন না—রমাদা'! সত্যি আপনি জানেন?

বইটি বন্ধ করার সঙ্গেই তিনি দৃঢ়গলায় বললেন—মোটেই নয়, কিছুই জানি না।

—তা হ'লে—?

ওঁকে যেন সেক্‌সপীয়রের মত দেখাচ্ছে, গৌরতনু, মাথায় বড় বড় চুল, আর ছুঁচালো দাড়ি আর ঘন গোঁফ।

তিনি এবার বললেন—আমার কোনো ম্যাজিক জানা নেই মিনতি, আমি যেভাবে থাকি সেই পথই আমি খুঁজে পেয়েছি। এই আমার জীবনের অভিব্যক্তি, আমাদের সকলকেই তার নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হয়।

আমি বললাম—আপনি মনে মনে একটা আনন্দের মধ্যে আছেন, সেই আনন্দই ত' আপনার শান্তি, আপনার কোনো চিন্তা নেই, উদ্বেগ নেই, সত্যি আছে কি? এই ব'লে তাঁর ভাবগম্ভীর মুখের পানে তাকালাম।

—না, এখন সত্যি আমার ভয়, ভাবনা, উদ্বেগ নেই, আগে কিন্তু ছিল। এখন একেবারে সেই—'নোঙ্গর তোড় দুঁ, কিস্তি খুদা পর ছোড় দুঁ', অর্থাৎ নৌকার নোঙর ভেঙে ফেলে দিয়ে নৌকাটি ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে রেখেছি। যেখানে গিয়ে ভিড়ে যায় যাক্।

—কিন্তু ভাবনাই বা নেই কেন আপনার? কত কি ভাবার রয়েছে, চতুর্দিকে এত রোগ, শোক, দারিদ্র্য, য়ুরোপের অশান্তি, দেশের রাজনৈতিক দুর্যোগ, কিছুই কি আপনাকে নাড়া দেয় না—?

ওঁর চোখদু'টি স্থির নীল হ্রদের জলের মত টল-টল করছে। উনি বললেন—আমি জানি এসব অতি ভীষণ কাণ্ড! ভাবলে জ্ঞান থাকে না। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন—কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে পারি মিনতি, আমার এতটুকু ভয় নেই। ভয় নেই তার কারণ,—আমি প্রমাণ পেয়েছি,

আমার জীবনে এমনই এক মহাশক্তি আছে যা এই সব অকল্যাণ আর অমঙ্গলকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে। যে কোনো বিপত্তি আসুক তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। রমানাথদা' আবার থামলেন, তারপর একটু হেসে বললেন—তুমি মিনতি, সময় ক'রে শ্রীঅরবিন্দের 'Life Divine' গ্রন্থটি একবার পড়ো, তাহ'লেই আমার কথার অর্থ বুঝবে। অফুরন্ত জীবনের সন্ধান তখন নিজের মধ্যেই পাবে।

আমি বললাম—জানি, একথা উনিও আমাকে বলেছেন। কিন্তু আপনি যে বললেন নিজের জীবনেই প্রমাণ পেয়েছেন, কথাটার মানে কি ?

রমানাথদা' এতক্ষণে চেয়ার টেনে বসলেন, তারপর কি ভেবে একটু হেসে বললেন—আমি খুব অল্প কথায় তোমাকে বলছি শোনো। ৪২এর আন্দোলনে মহিষাদল থানার মছলন্দপুর গ্রাম থেকে পুলিস আমাকে ধরে নিয়ে যায়—তারপর একটা ছোট ঘরে পুরে ভীষণ প্রহার সুরু করে। পরে তমলুকে পুলিস সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তিনি আমাকে বেত মারতে সুরু করলেন, আমার নখের গোড়ায় পিনফোটানো হ'ল। আমাকে বণ্ড সই করতে বলল, আমি বণ্ড সই করলাম না, আমার বুকের ওপর বুট চাপিয়ে দিল, ফলে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম, আমার নাকমুখ দিয়ে রক্তপাত হ'ল। ঐদিন অভুক্ত রইলাম, তারপর সুতাহাট থানায় পাঠিয়ে দেয়।

আমি শিউরে উঠলাম—বললাম—বলো কি! রমাদা', এত অত্যাচার? বিদেশী লোক ব'লে কি এতটুকু মায়া দয়া হলো না তাদের ?

—বিদেশী লোক ? দেশী লোকই কি কিছু কম করেছে, কেন জয়ন্ত বলেনি ? ওকে ত' শীতের রাতে পুকুরে ডুবিয়ে রেখেছিল, ঐ মহিষাদলে ওকে বেত মেরে তারা কাটা ঘায়ের ওপর নুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। সে আমাদের দেশী পুলিসরাই করেছিল, তারপর তমলুকে পুলিসের সেই বড়সাহেবের কাছে নিয়ে যায়। থানায় নিয়ে গিয়ে ছত্রিশ ঘণ্টা কিছু খেতে দেয়নি।

আমি এসব কথা শুনিনি, বললাম—না, রমাদা', আমি ওঁর এসব লাঞ্ছনার কথা

শুনিনি। কি যে ওঁর পার্টি, কি যে করেছেন আর কি করছেন তা কখনও বলেন নি। আমিও কিছু জানতে চাই না।

—ভালোই করেছ। স্বামীর গুণাগুণ অপরের মুখে শোনাই ভালো। আমার কিন্তু, এই অত্যাচারের ফলে, ভালোই হ'ল। আগে আর সকলের মতোই এসব কথায় আমার বিশ্বাস ছিল না, বরং অশ্রদ্ধা ছিল। প্রহারের ফলে অবস্থা অতিশয় কাহিল হওয়াতে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। সেখানে কিছু অবসর পেলাম ভাবনা-চিন্তার। আমার পাশের বেডে ছিলেন একজন জড়বাদী। তাঁর মতে সব কিছুই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া—মানুষ আর মূষিক, পাহাড় আর অরণ্য সব কিছুই সেই রাসায়নিক কাণ্ড! তাঁকে অবশ্য বললাম—বেশ, কিন্তু অম্লানবদনে তাঁর বক্তব্য মেনে নিতে পারলাম না।

এই রাসায়নিক কাণ্ডটা ঘটাচ্ছে কে, কি তার শক্তি, জানার প্রচণ্ড বাসনা হ'ল। নিশ্চয়ই সব কিছু খেয়াল খুসীমত হচ্ছে, এর পেছনে একটা বেশ বাঁধাধরা আইন রয়েছে, কে সেই আইন গড়েছে, চালাচ্ছেই বা কে? আইনটি সূক্ষ্ম, তার প্রয়োগও সূক্ষ্মতর। এতটুকু এদিক ওদিক হলেই ত' প্রলয় ঘটে যেত। সুতরাং জীবন, তার স্রষ্টা, সেই অদৃশ্য পুরুষের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি, বা Cosmic Law, বা যে কোনো সৌখীন নামই বল না কেন, তখন স্পষ্ট মনে হ'ল এই বিচিত্র বিধান বুঝেছেন কোনো কোনো মনীষি, আর তাঁদের সেই জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের জন্য উজাড় ক'রে দিয়েছেন।

হাসপাতালে শুয়ে আমি ক্রমশঃ এই দিব্য-জীবনের সন্ধান পেলাম, সন্ধান পেলাম সেই অনির্বচনীয় পুরুষের, বাধ্য হলাম তাঁর পথ খুঁজে বা'র করতে, সেই পথই সত্যের পথ, অমৃতের পথ। এই হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম—আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, বই লিখেছি, কত সভা সমিতি গড়েছি, কলহ করেছি, অতি সূক্ষ্ম বিচার করেছি, প্রার্থনাও করেছি—কিন্তু জীবনে তাঁকে কতটুকু গ্রহণ করেছি?

—আপনি নিশ্চয়ই সে চেষ্টাও করেছেন।

আবার সেই একতরফা হাসি হাসলেন রমাদা', বললেন—হ্যাঁ, চেষ্টা আমরা করেছি। শুধু চেষ্টা করা নয়, নতুন ক'রে পাঠ নেওয়া। এই শিক্ষার সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হ'ল এই যে, আগে যতটুকু শিখেছ তার সবটুকু ভুলে যেতে হবে। যখন শুনি 'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ' তখন শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু কাজে আমরা ক'জন সেই ভাব মনে রাখতে পারি? যখন ধরো মাসের পর মাস কাজ ক'রে যাচ্ছ অথচ মাইনে পাচ্ছ না, অথচ তোমার কাছে পাওনাদার টাকা চাইছে, ছেলের অসুখে ওষুধ দিতে পাচ্ছ না, আর তোমার পুরাতন বাতের ব্যথা কিছুতেই কমছে না, তখন অবশ্য অন্য রকম মনে হতে পারে—

—অন্য রকম! কি বলছেন রমাদা'?

মাথা নেড়ে রমাদা' বললেন—ঠিকই বলছি,—অসম্ভব কিছুই নয়। বিশ্বাস যদি না থাকে ত' সবই অসম্ভব। বিশ্বাসীর কাছে অনেক কিছু, অবিশ্বাসীর কাছে সবটাই শূন্য। যদি কেউ একজন আছেন মনে এই বিশ্বাস থাকে, তবে সেই মহাশক্তিকে ডাকতে বাধা কি,—বিশ্বাসেই আশ্বাস পাবে—

—অর্থাৎ? আরো পরিষ্কার ক'রে জানার জন্যই প্রশ্ন করলাম।

উনি বললেন—আমি দেখলাম জীবনের প্রবহমান স্রোত, তার শক্তি অসীম, প্রচণ্ড বেগ, সেই স্রোতের মুখে তুমি আমি কেউ কিছু নয়,—একটা বিরাট অদৃশ্য শক্তি আমাদের চালিয়ে নিয়ে চলেছে—আমরাও দিশেহারা হয়ে ছুটে চলেছি, কোথায়, কেন, কিসের সন্ধানে ছুটছি তা কিন্তু জানা নেই। আমরা শুধু সেই মহাশক্তির হাতের কাজের কিছু অংশ ইতস্তত: দেখতে পাই,—মাছের পাখনা, প্রজাপতির ডানা, শীতের দেশের প্রাণীর গায়ে মোটা পশম, পাখির গায়ে পালক—কে সেই শিল্পী এত বিচিত্র রঙ দিয়ে এমন কায়দায় এ সব তৈরী করছেন, আমরা রঙ দিয়ে ক্যানভাসে তার একাংশও ফুটিয়ে তুলতে পারি না। সৃষ্টির প্রথম দিন

থেকে সেই অদৃশ্য পুরুষের অক্লান্ত তূলি কাজ করছে, ক্লান্তি নেই, ক্লেশ নেই,—নিপুণতার অভাব নেই, কে সেই গুণী? বসন্তের ফুল, বরষার বিরাম-বিহীন ধারা,—সব কিছুর ভিতরই ত' সেই প্রচ্ছন্ন হস্ত—সেই অফুরন্ত প্রাণের পরিচয়, এ সব কথা অনেক শুনেছি কিন্তু কোনোদিন বুঝিনি।

রমানাথদা' উঠে দাঁড়ালেন—জানলার কাছে গিয়ে বাইরে মাঠের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর আবার বললেন—হাসি পাচ্ছে না? আমার বক্তৃতা শুনে ভাবছ রাজনীতির প্রহারে পরাজিত হয়ে পলায়নীবৃত্তি গ্রহণ করেছি। একেবারে পাজি বুর্জোয়ার মনোবৃত্তি! কিন্তু দেখ এই সংসারে সবাই আমরা আছি, তবু একজন সাধু বা বৈজ্ঞানিক, কোনো বিরাট বস্তুর কথা ছেড়ে দাও, একটা ঘাসের ওপর শিশির-বিন্দুর কোনো উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে পেরেছে? গোলাপের রঙ কিংবা রজনীগন্ধার বাহারের কথা ছেড়ে দাও, একটি তৃণকণার ব্যাখ্যা করার শক্তিও কারো নেই। অনেক আমরা বক্‌তে পারি, অনেক তর্ক, লজিকের ম্যাজিকে কিন্তু আসল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে না।

রমানাথদা' আবার সেই হাসি হাসলেন।

বললেন—বিশ্বাসটাই আসল, বিশ্বাস হওয়া এবং করাটাই শক্ত—কিন্তু একবার এই অমৃতের আস্বাদ পেলে সব ভুলে যাবে। আম পেলে আমড়ায় আর আটকে থাকবে না। যাই হোক্, আমার বিশ্বাস আছে তাই আমার আনন্দও আছে—

ওঁর কথাগুলি আমার কানে অলৌকিক ঠেকছিল। কারণ যাকে বিশ্বাস করছি তাকে দেখতেও পাই না, ছুঁতেও পাই না, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক বিচিত্র বিশ্বাস! আমি আরো কিছুর সন্ধানে ছিলাম, এমন কিছু যা স্পর্শ করা যায়, যা অনুভব করা যায়, যাকে আঁকড়ে ধরতে পারি। তাই আবার প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা রমাদা', আপনার যেমন বিশ্বাস এসেছে এই বিশ্বাসটা আনবো কি ক'রে? আমি ত' বুঝতে পারি না কিসে কি হয়!

উনি মাথা নাড়লেন।

হেসে বললেন—এইরকম সকলেরই মনে হয়। প্রথমটা কিছুই পরিপূর্ণরূপে মেলে না, অনেক সময় লাগে, অনেক কষ্টে তবে মনস্থির করা যায়, মন এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে। মনটাই আসল শয়তান,—মন যত্র তত্র ঘুরে বেড়ায় চঞ্চল হয়ে, তাকে এক জায়গায় বন্দী করতে হবে। একদিনে কি হয়, চেষ্টা করতে হবে। আমরা হাজার চেষ্টা করলে কি ভ্রুর দৈর্ঘ্য বাড়াতে পারি? নাকটা চোখের ওপরে তুলতে পারি? পারি না—কিন্তু উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা কমিয়ে আনতে পারি, তাতে উৎসাহ বাড়বে, অন্তরে আনন্দ পাবো। নিজে সহজ হ'লেই আর সব সহজ হয়ে যাবে। তাহলেই বাঁচার মত বাঁচতে পারবে।

—আপনার মন তাহ'লে স্থির হয়েছে,—এতটুকু নড়চড় নেই!

—না, তবে কি জানো মিনতি, আমি সব ছেড়ে রেখেছি শুধু অখণ্ড বিশ্বাস, আর কিছু রাখার জায়গা নেই সেখানে। এ পথ অতি সোজা শুধু, মনটাকে জোর ক'রে এক জায়গায় বসানো। অথচ যা সহজ তাতে আমাদের শ্রদ্ধা নেই, যে পথ যত ঘোরালো সেই পথেই সাধারণের আগ্রহ।

—সত্যিকথা, কিন্তু যা সহজ তাতেও ত' মানুষ আকৃষ্ট হয়, তবে মনে হয় পাছে লোকে হাসে তাই মানুষ অনেক সময় কাছাকাছি পৌঁছেও ইতস্ততঃ করে।

রমানাথদা' অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন—একটানা হাসি।

এমন সময় লেডী ডাক্তার মিসেস দে সরকার এসে ঘরে ঢুকলেন। রমানাথদা'কে দেখে বললেন—কি রমানাথ, এখানে এসেও বক্তৃতা দিচ্ছ,—তোমাকে নিয়ে আর পারি না বাবা,—এখন পালাও দেখি—অনেক কাজ আছে—

রমানাথদা' বললেন—সরযূ মাসিমা, একদিন আপনার বাড়ি গিয়ে বক্তৃতা ক'রে আসবো। শুনবেন ত', না কলে দৌড়াবেন!

মিসেস দে সরকার একগাল হেসে ব'লে উঠলেন—তোমার কথায় আর আমার বিশ্বাস নাই। বরাবরই তাই বলছ, যাও কই।

রমানাথ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে বললেন—এইবার ঠিক যাব।

দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গেই সরযূ মাসিমা শাড়িটা ঠিক ক'রে নিয়ে—এনামেলের গামলায় গরম জল আর বোরিক তুলো নিয়ে কাজে লেগে গেলেন।

অনেক পরে মাসিমা যখন বাচ্চাটাকে তোয়ালে জড়িয়ে আমার পাশে রেখে দিয়ে আবার ঘরের জানলা খুলে দিলেন, আর সেই নবজাতক আমার মুখের দিকে পিট্ পিট্ ক'রে তাকিয়ে রইল তখন আবার রমানাথদা'র কথাগুলি আমার কানে অতি পরিচিত গানের সুরের মত ভাসতে লাগল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম নিজের জীবনের কথা। আমি আজ যে এই-ভাবে এইখানে মালতী মাসিমাদের বাড়ি এসে পড়ব কে জানত, আমার প্রথম সন্তান জয়তী এই মহেশতলা ভবনেই ভূমিষ্ঠ হ'ল। আমার বাবা বা মা রমানাথদা'র এই সব কথা যদি শোনেন কি ভাববেন! মিসেস হাজরার হাসি, আমার মার স্ববারি, দ্বারিকবাবুর মেজাজ, ইত্যাদি এই পরিবেশে কি বে-মানানই মনে হয়! সেই প্রাচীন জীবন, ফেলে-আসা দিনের পরিচিত মানুষগুলিকে আজকের দিনের এই লোকগুলির পাশে এনে যদি দাঁড় করাই, তাহ'লে! ওরা যেন পুতুল-নাচের আসরের পুতুল আর রমানাথদা' প্রভৃতিরা সেই পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী যার খোঁজে মানুষ বুভুক্ষু হয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শীলা আমার ঘরে প্রায়ই আসত,—খাবার নিয়ে আসা এবং খাওয়ানোটাই ছিল তার প্রধান কাজ। জোর ক'রে খাওয়ানোর জন্যই কি জেদ তার! মনে মনে ভাবতাম আমার ওপর ওর কোনো ঘৃণা আছে কি না কে জানে? এখন ত' স্পষ্ট বুঝেছি জয়ন্তকে শীলা সত্যি ভালোবাসতো। বাহ্যতঃ কিন্তু এতটুকু প্রকাশ পায়নি তার মনোভাব। কিন্তু তাতে কি আসে যায়—যারা শুধু সাহসী তারাই কেবল নিজের মনের কথা প্রকাশ ক'রে বলতে পারে। অন্ধকারের ভিতরই লুকিয়ে থাকে ঈর্ষার কালো ছায়া—

হয়ত শীলার মনে কোনা ঈর্ষা নেই,—কিন্তু যদি থাকে, যদি ওর দীর্ঘশ্বাস আমার জীবনটা শুকিয়ে দেয়!

এখন ঠিক মনে নেই, ঠিক কি ভাবে কথাটা পেড়েছিলাম,—শুধু মনে আছে—শীলা জানলার পাশে পা ছড়িয়ে ব'সে আমার খাওয়া দেখছিল—ওর চমৎকার পা দু'খানি আমি এক মনে দেখছিলাম,—কি চমৎকার গড়ন, লক্ষ্মণ কি এই জন্যই সীতার মুখের দিকে না তাকিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেন? সুগঠিত একজোড়া ফরসা পায়ের অপূর্ব মাদকতা।

শেফালী বলল—কি দেখছিস্ ভাই? অমন হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছিস কেন?

আমি বললাম—কি পা ভাই তোমার, ইচ্ছে ক'রে ধুয়ে জল খাই—

—এই ইচ্ছে, খাস্ না কেন? বিনা মূল্যে বিনা মাশুলে দেব। কিন্তু হঠাৎ পায়ের কথা কেন?

—তুমি এমন ক'রে বসেছ তোমার সমস্ত পা দু'টি বেরিয়ে আছে, রঙীন কাপড়ের বাইরে ওই ফরসা আলতা-পরা পা ভারী মানিয়েছে।

—ইস্, একেবারে ভারতচন্দ্র—সেই

"আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল্ ॥"

—সত্যি তাই। জানোত' তারপর—

তুমিও জানলাটা সোনা করে দিয়ে বসেছ।

"সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥"

—তাহ'লে?

"সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥"

দেখছিস কি একেবারে সাক্ষাৎ দেবী।

—মিথ্যা বলোনি শীলা। তুমি দেবী, মানবী নও।

শীলা এতটুকু লজ্জিত হ'ল না, বা আমার কথায় রাগ করল না, শুধু হাসতে লাগল, দুষ্টুমি-ভরা হাসি। যেন আমার কথায় সে খুসী হয়েছে।

আমি বললাম—তুমি যে ভাবে আমাকে তোমার যথাসর্বস্ব দান করেছ, তা দেবীর যোগ্য বটে।

শুনলাম—জয়ন্তকে চিরদিনই সে ভালোবাসত, একরকম ছোটবেলা থেকে, ওদের বাল্যকাল একত্র কেটেছে। শীলা একটু হেসে বলল—তখন থেকেই ভালোবাসতাম ওকে বড়দের মতো। হয়ত তা অসম্ভব বা অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়—।

আমি কল্পনা নেত্রে শীলার বাল্যকাল দেখতে লাগলাম, নীল ফ্রকপরা ছোট্ট মেয়েটি, মাথার একগোছা চুল হাওয়ায় উড়ছে, জয়ন্তর পিছনে দৌড়চ্ছে হয়ত—যখন চুপচাপ—তখন ওর মুখ গম্ভীর—

আমি বললাম—তুমি ওঁকে ছেড়ে দিলে কেন? আমার হাতে এমন ভাবে সঁপে দিলে কেন শীলা?

শীলা ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল—দেখ মিনতি, ব্যাপারটা খুবই সরল,—জয়ন্ত আমাকে বোনের মতো দেখতেন, একেবারে আপন ভায়ের মতো,—আমি ছেলেদের সঙ্গেই খেলাধুলা করতাম বেশী।

—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করো শীলা, আমি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম বলোত'?

—তাই ত', তোর কেমন সুন্দর কাপড়, কেমন গয়না, কেমন মাথার চুল, কেমন গায়ের রঙ, হাতের নখে পালিশ, তোকে দেখে রাগ হয় বৈকি—আমার 'ত' ওসব বালাই নেই।

—আঃ শীলা।

—আচ্ছা, তোর ওসব ছিল না?

—ছিল, তখন বুঝতাম না, কিন্তু এখন কি আমার নখে পালিশ আছে? পরণে কি সেই শাড়ি আছে? মোটা খদ্দরের ঠেলায় গায়ে ঘামাচি বেরিয়ে গেল—

—না, এখন নেই বটে। এখন তুই অবলা, সরলা, পল্লীবালা।

—তাহ'লে এখনও কি রাগ আছে? বলো?

—ওরে মুখ্খু, রাগ এখন পড়ে এসেছে, তুই কি তা জানিস না,—সে কথা কি তোর সত্যি অজানা?

আমার গলায় কি যেন আটকে গেল। আমি কিছু বলতে পারলাম না।

শীলা বল্‌ল—এইটুকু জেনে রাখো, আমি যদি সত্যি জয়ন্ত'র জন্য পাগল হ'তাম তাহ'লে কি ভাই তুমি এসে নাক গলাতে পারতে? কেউ-ই পারতো না। বিবাহ কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়তার যোগ যদি সহজ হয়ে আসে তাহ'লে তার মধ্যে কিছু মাধুর্য থাকে। যা খাঁটি তাকে কি কেউ ভাঙতে পারে?

আমি ভাবতে লাগলাম আমাদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনের কথা। যদিও যুক্তি স্বপক্ষে ছিল—তবু যে অদৃশ্যসৌধ গড়ে তুলেছিলাম তা যে কারো কঠোর স্পর্শে যে-কোনো মুহূর্তে মাটিতে মিশিয়ে যেতে পারে সে কথাও ভাবলাম।

মুখে বললাম—ভগবান জানেন ভাই। তবে মাঝে মাঝে যে-সব বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা নজরে পড়ে, বা পরিচিতদের দু'চার জনের মধ্যে যে কাণ্ড দেখেছি তাতে অবিশ্বাসেরও কিছু নেই।

—সত্যি কথা! কিন্তু ওসব বিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বভাব-ঘটিত বা যৌন-ঘটিত, তা ছাড়া ঘর ছেড়ে পালানোর একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিও ত' মানুষের আছে। অনেক সময়, কারো সঙ্গে যে গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে অনেক হাঙ্গাম, অনেকখানি সাহসের প্রয়োজন ব'লেই মানুষ তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। আমাদের চিন্তাধারাও অত্যন্ত আচ্ছন্ন। নয় কি? আমরা ভাবি বিয়ের ভিতর একটা ম্যাজিক আছে যা আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে আমাদের একেবারে সুখের সপ্তম সর্গে নিয়ে যাবে—তারপর যখন আবিষ্কার করি যে, চতুর্দিকে ঠিক যেমনটি দেখছি অবস্থা তার চেয়ে এতটুকু ভালো নয়, তখন আমরা অসমান বিবাহ বা স্বামীকে নিন্দা করি। যদি সাহস বা সামর্থ্য থাকে তাহ'লে আর একজনকে আঁকড়ে ধরি, ভাবি স্বর্গের চাবিকাঠি তারই

হাতে—একটু থেমে শীলা আবার বলতে সুরু করল—জয়ন্ত সম্বন্ধেও তাই, যদি ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হ'ত তাহ'লে এমন কি তুইও এসে সুবিধে করতে পারতিস না।

আমি শুধু বললাম—না, আমি কিছুই করতে পারতাম না।

অনেকক্ষণ আমরা চুপ ক'রে রইলাম। আমার খাওয়া শেষ হওয়ার পর শীলা অনেকগুলি গান শোনালো। আমি শুধু মনে মনে জয়ন্তকে যে পেয়েছি এই আনন্দেই মসগুল হয়ে রইলাম। মনে হ'ল যেন কত দীর্ঘপথ পেরিয়ে এলাম,—অথচ ঠিক দু'বছরও হয়নি।

অনেকক্ষণ পরে আবার বললাম—শীলা ?

—কি ভাই ?

—এখনও ত' সারা জীবন পড়ে আছে, কি নিয়ে থাকবে ঠিক করেছ ?

এতক্ষণে পায়ের কাপড় টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শীলা, বল্‌ল—তা আছে, কিন্তু কি হবে কি ক'রে বলব, তুই বলতে পারিস ? আমরা কেউ-ই পারি না। হয়ত জোয়ান অব্ আর্ক বা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হয়ে জীবন কাটাব—সে জীবনে স্বামী ত' একটা বিরাট বাধা।

শীলা হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উনিশ

জয়তীর পাওনা

রাঙা-কুঠিতে ফিরে আসবার ঠিক দু'দিন আগেই হঠাৎ বাবা এসে হাজির।

শীলা পরে বলেছিল, সে নিজে দরজা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু ঠিক চিনতে পারেনি। শীলা বলেছিল—গাড়িটা দেখে ভেবেছিলাম আমাদের কেউ নয় নিশ্চয়ই,—কিন্তু যখন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন তখন ভাবলাম হয়ত কোনো ফিলমের কর্তা, জয়ন্তর বইটই সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছেন।

মালতী মাসিমা ছুটে এলেন,—বাবার আগমনবার্তা শুনিয়ে বললেন—যদি তুমি দেখা করতে না চাও ত' যাওয়ার দরকার নেই, আমি ঠিক মানিয়ে নেব।

মাসিমা নীচে নেমে গেলেন, ওঁর পায়ের আওয়াজ শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম, উনি যদি এখন এখানে থাকতেন কত সুবিধে হত। উনি খবরের কাগজ সেরে আমাদের কয়েকটা জিনিষপত্র কিনে সেই লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরবেন।

সিঁড়িতে মালতী মাসিমার মিষ্টি গলা আর বাবার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বুঝলাম মাসিমা ইঙ্গিতে আমার ঘরটা দেখিয়ে চলে গেলেন। দরজা ভেজান ছিল, বাবা দরজা খুলে ভেতরে এসেছেন বুঝলেও তাঁর দিকে তাকানোর সাহস আমার ছিল না।

আমি বিছানার ওপর খবরের কাগজটায় মুখে রেখে বোধ করি এক মুহূর্ত চুপ

ক'রে ছিলাম—কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন একটা অন্তহীন কাল—অবশেষে মুখ তুলে দেখলাম বাবা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

একবছর দশমাস আগে তাঁকে শেষ দেখেছি,—আমার বাবা! জয়তী ওঁর কাছে যেমন আমার বাবার কাছে আমিও তাই, আমাকে সেই শৈশবে মায়ের বুকে তিনি দেখেছেন—আমার সকল অঙ্গে ছড়িয়ে আছে তাঁর স্নেহের স্পর্শ।

বাবা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন—একটু যেন ঝুঁকে পড়েছেন, দেহের পেশীগুলো যেন একটু ঢিলে হয়ে গেছে, গায়ের মাংস কেমন থল্থলে। যেন কাপড়-জামার দোকানের মোমের পুতুল—

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পায়ের ধুলো নিলাম। বাবা একটু হাসবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর ঠোঁট দুটি সামান্য ফাঁক হ'ল মাত্র, তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

আমি বললাম—আশাই করিনি তুমি আসবে! বসো না বাবা।

বাবা সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন, আমাকে বললেন,—গোলাপের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার কাছেই শুনলাম তোর বাচ্চার কথা। বজবজ যাচ্ছিলাম, ফেরার পথে তাই চ'লে এলাম—

আমি একটু চুপ ক'রে রইলাম তারপর বললাম—বেশ করেছ, বসো না বাবা—

ভারী অস্বস্তি বোধ করছিলাম। বাবাকে ভয় করতাম, কিন্তু আগে তা বুঝিনি, এখন তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হলেও আমার ভয়। বাবার কাছ থেকে চ'লে এসে আমি মুক্তপক্ষ পাখির মত হালকা হয়ে গিছলাম। এতদিন পরে বাবাকে দেখে আমার মনে সেই পুরাতন আবেগ প্রবল হয়ে উঠল। এই একটি মানুষকে আমি আজীবন ভালোবেসে এসেছি,—আমার জীবনে মায়ের স্নেহস্পর্শ এতটুকু নেই।

বাবা বললেন—তোর মেয়ে কেমন হয়েছে?

—হয়েছে একরকম, সাড়ে ছ' পাউণ্ড ওজন।

—তাই নাকি! নিয়ে আয় একবার দেখি। কেউ কিন্তু জানে না আমি এখানে এসেছি।

কেউ অর্থাৎ আমার মা—বাবার ভয় হয়েছে, মা যদি টের পান তাহ'লে একটা কেলেঙ্কারী হবে। তিনি চাকর-দাসীর সামনেই হৈ চৈ সুরু করবেন।

আমি শুধু বললাম—তুমি একটু বোসো বাবা, এখনই নিয়ে আসছি।

খুকীকে নিয়ে এসে বললাম—এই নাও, এখন তুমি ত' দাদু হ'লে জানো—

বাবা হাত দিয়ে টাইটা ঠিক ক'রে দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছলেন। তারপর একটু হেসে বললেন—প্রভেদটা কোথায় বুঝছি না ত'? কিন্তু তোমার ইয়ে—মানে স্বামী কোথায়?

আমার স্বামী! কথাটা কেমন যেন শোনালো। মনে মনে হাসলাম। এই প্রথম বাবা তাঁর জামায়ের খোঁজ করছেন,—হয়ত ওঁর নামটাও বাবার স্মরণে নেই।

বললাম—তিনি ফিরবেন লাস্ট ট্রেনে, কাজকর্ম সেরে, কিছু কেনাকাটাও আছে তাই দেরী হবে ব'লে গেছেন। আমরা পরশু বাড়ি ফিরে যাব কিনা—

বাবা মাথা নাড়লেন, স্পষ্ট বোঝা গেল কিছু একটা বলতে চান, কিছু জানতে চান, অথচ বলতে পারছেন না, হয়ত জয়ন্ত এবং আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল, কি ভাবে কেমন ক'রে চলছে ইত্যাদি, কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না।

আমি বললাম—হয়ত গোলাপ তোমাকে বলেছে আমরা এখন সেই রাঙা ঠাকুমার বাড়ি 'রাঙা-কুঠিতে' থাকি—, তুমি ত' রাঙা ঠাকুমাকে জানতে?

—কি জানি, আমার স্মৃতিশক্তি অল্প।

বাবা আবার পকেট থেকে রুমাল বা'র ক'রে মুখ মুছলেন। অনেকক্ষণ নীরবতার পর আমি আবার প্রশ্ন করলাম—

—মা কেমন আছেন, বাবা?

বাবার চোখে আবার সেই হারিয়ে-যাওয়া দৃষ্টি।

তিনি বললেন—ভালোই আছেন এখন,—মাঝে একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, সর্দি কাশি, এখন অনেক ভালো,—ক্রীস্‌মাসের পর বাইরে কোথাও যেতে পারেন—

বাইরে, অর্থাৎ দ্বারিক, মিসেস হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাড়ি দেবেন।

বললাম—বাবা, মা জানেন না কি, আমার মেয়ের কথা?

—হ্যাঁ, শুনেছেন বৈ কি!

মনে হ'ল মার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে, দিদিমা হওয়াটা মার কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যৌবনের পরাজয় মা কিছুতেই ঘটতে দেবেন না। মার জীবনে আমার কোনো অস্তিত্ব নেই, আমাকে তিনি ধুয়ে মুছে ফেলেছেন।

কল্পনানেত্রে দেখলাম পূজার পর মা ছুটেছেন মুসৌরি বা নৈনিতালে, হাতে ছড়ি, পরনে ফ্লানেলের ট্রাউজার।

বাবা হাত বাড়িয়ে জয়তীকে কোলে তুলে নিলেন, অতি সন্তর্পণে তিনি জয়তীকে ধরেছেন—বহুমূল্য বস্তুর মতো। বললেন—

—যদি ফেলে দিই, আমার হাতে ছোট ছেলে মেয়ে অনেক দিন উঠেনি যে রে, —চমৎকার মেয়ে তোর—

জয়তীর বুদ্ধি আছে, সে একবার চোখ মেলে দাতুর মুখের দিকে তাকাল। বাবা এইবার প্রাণখোলা হাসি হাসলেন।

জয়তীর চোখ দু'টি বেশ বড় বড়—

বাবা ব'লে উঠলেন—ওরে বাবা, ওযে হাসে রে—

বাবার চোখে সেই স্নেহময় দৃষ্টি, মুখে প্রশান্ত হাসি, কালের স্পর্শ তাঁর মুখ থেকে এই হাসিটুকু এখনও কেড়ে নিতে পারেনি।

অতি অল্পক্ষণ,—সে হাসি আবার মিলিয়ে গেল।

ঝি এসে খুকীকে নিয়ে গেল—দুধ খাওয়াবে।

বাবাও সেই সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন—বললেন—মিনতি আমি আজ যাই, আবার যদি এদিকে আসি ত' আসব'খন।

আমিও আকুল আগ্রহে বললাম—একদিন এসো বাবা, আমাদের বাড়িটা মাইল খানেকের মধ্যে—

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বাবা শুধু বললেন—আচ্ছা, তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে আবার বললেন,—তোমার মা কিন্তু এখনও তোমার উপর চটে আছেন। খুব দোষ দিতেও পারি না তাঁকে, তাঁর আশা ছিল অন্য রকম, অনেক বড়—

আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম—বাবা, আমি বড় হয়েই আছি, ছোট হয়ে নেই,—আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ আমাকে উজাড় করে ঢেলে দিলেও আমি আমার এই ঐশ্বর্য ছেড়ে যাবো না।

বাবা মাথা নাড়লেন—বললেন,—আমি আর কি বলব, কি-ই বা বলতে পারি, যা হয়ে গেছে গেছে, এখন আর তার হিসাব-নিকাশের কি দরকার। আমি কিছু বলিনি—

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেদিন সকাল বেলাকার কথা—সেদিন বাবা সত্যি অতিশয় চটে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় ওঁকে গাল দিয়েছিলেন, সেদিন সে সব কথায় আমার ভয় ছিল, আজ আর আমার ভয় নেই, আজ আমি হাসতে পারি।

রুমাল বা'র ক'রে মুখটা মুছে বাবা বললেন—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

আর তিনি দাঁড়ালেন না।

কুড়ি

দিনের পর দিন

ওঁর উপন্যাসটা আষাঢ় মাসেই প্রকাশিত হয়ে গেল। গোড়ার দিকে তেমন কোনো উত্তেজনা ছিল না, যেমনটা ওঁর কবিতা বা প্রবন্ধের বই দু'টিতে লক্ষ্য করেছি ; কিন্তু উত্তেজনা ছিল ওঁর মনে, ছ' মাস পরিশ্রমের ফলে যে সাফল্য এসেছে তার জন্য উনি খুসী। মাইনের টাকা ছাড়া বাড়তি দু' চার টাকা এতদিনে আমাদের হাতে এল।

রবিবার হ'লেই দৈনিকের পৃষ্ঠায় খোঁজাখুঁজি চলতে লাগল সমালোচনার সন্ধান। ভালোই লিখছিল অনেকে, কেউ কেউ আবার একটু-আধটু টিপ্পনী করেছে। মোটামুটি ভালোই বলেছে সবাই।

আমি অবশ্য আশা করেছিলাম সবাই মাস্টারপীস ব'লে হৈ চৈ সুরু করবে, কিন্তু তা হয়নি। কেউ কেউ, বিশেষ ক'রে পরমেশ্বর বসুর মতো উন্নাসিক সমালোচক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি বিস্তারিত সমালোচনা লিখেছিলেন 'চতুর্মুখ' পত্রিকায়, সাহিত্যিক মহলে তাই নিয়ে নাকি একটু কানাকানি চলেছে। কেউ বিশ্বাস করছে না পরমেশ্বরবাবুর সঙ্গে ওঁর জানাশোনা নেই।

জীবনের ধারা যেন সমুদ্রযাত্রার মতো, আমার মনে হয়েছিল সেই সময়টা অন্ততঃ আমরা অনুকূল বাতাসের মধ্যে ছিলাম।

খরচ-খরচা বাদ দিয়েও কিছু সঞ্চয় হচ্ছিল, তাই উনি কিছুতেই আমাকে স্কুল-

মাস্টারি করতে দিলেন না। আমাদের মনে তখন প্রচুর আশা, দেহে সতেজ উৎসাহ, অন্তরে যৌবন-জ্বালার দাহ,—আর পেয়েছিলাম জয়তীকে—

ভাবতাম কি ক'রে সময় কাটিয়েছি, জয়া না থাকলে কি ক'রে চলেছে এতদিন ? একটা ছোট্ট শিশু যে এতখানি সময় ভ'রে থাকে তা আমাদের জানা ছিল না—আমরা ঠিক করেছিলাম এতটুকু হৈ চৈ না ক'রে জয়তীকে অতি সাধারণ ক'রে সাধারণের মতোই মানুষ করতে হবে, জীবনে এতটুকু বাহুল্য থাকবে না। আধুনিক ভাবাবেগহীন ও বুদ্ধিমতী ক'রে তাকে মানুষ ক'রে তুলতে হবে।

জয়তী অবশ্য সেই অল্পকালেই তার প্রাপ্য ঠিকমত আদায় ক'রে নিচ্ছিল। আর আমরা এদিকে সর্বকর্ম পরিত্যাগ ক'রে কোথায় তার একটা দাঁত বেরোল, কোথায় সে হাসছে তাই নিয়ে মাতামাতি করতাম, যেন পৃথিবীতে জয়তী একমাত্র শিশু যে মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে পারে, কিংবা অমন একমেবাদ্বিতীয়ং দাঁত নিয়ে সবাইকে দেখাতে পারে। প্রেমের ছায়াতেও মানুষের যুক্তি, আশা, নীতি সব কিছুই মুছে যায়—

আগেও তাই হয়েছে, এদিনেও তাই হয়······

বৃন্দাবন, বাতের ব্যথায় কাতর, কত তার রাগ, দিনরাত বিড় বিড় করছে, তবু বিকালে একবার মহেশতলা ভবন থেকে আসা চাই। জয়তীর পেরামবুলেটর গাড়ির একছত্র চালক বৃন্দাবন, অন্য কারো হাত দেওয়ার উপায় নেই। গোঁসাই-পাড়ার মোড় পর্যন্ত খুকীর গাড়িটি ঠেলে নিয়ে যাওয়া যেন তার জীবনের ব্রত।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের উপর থেকে যত দূর পর্যন্ত দেখা যায় তাকিয়ে থাকতাম।

অনেক সময় আমি রান্নাঘরে আছি মনে ক'রে বৃন্দাবন পরমানন্দে খুকীর সঙ্গে কথা বলত। 'বৃন্দাবনের সঙ্গে চালাকী নয়', 'বৃন্দাবন তোকে মানুষ ক'রে দিয়ে তবে মরবে', 'ঘুমো সোনা মেয়ে, তোকে দুধে চান করাব, একেবারে পরী হয়ে যাবি।' ইত্যাদি।

একদিন বুঝি জয়তী বৃন্দাবনের দাড়ি ধ'রে টেনেছিল। বৃন্দাবনের জীবনে সেটি একটি ঘটনা। সারা সপ্তাহ ধ'রে সবাইকে সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনিয়েছে বৃন্দাবন।

সময় পেলেই আমাকে উপদেশ দিত, কিভাবে জয়তীকে মানুষ করা উচিত,—পাঁচজনের কথায় কান দিয়োনা দিদিমণি, আমি সাতটা ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছি, রমানাথ সোমনাথের বাবাও আমার কাছে মানুষ। দিনগুলি কোথা দিয়ে কাটত কে জানে, কাজের শেষ ছিল না, ওদিকে উৎসাহিত হয়ে উনিও বসেছিলেন আর একটি উপন্যাস নিয়ে। বাড়ি ফিরেই উপন্যাস নিয়ে বসতেন।

সেই আমার সোনা রঙের দিন।

দিনের পর দিন চলে যায়। গোলাপ ফুলের পাপড়ি যেমন ঝরে পড়ে, কালের হাত থেকে তেমনই খসে পড়ে একটির পর একটি দিন।

একুশ

নোয়াখালির ডাক

১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট সুরু হয়েছিল মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস। কিছুতেই যখন কন্‌গ্রেস আর মুসলিম লীগের মিলন হ'ল না—একটা গোপন বৈঠকে কোনো লীগনেতার মাথা থেকে বেরিয়েছিল এই পরিকল্পনা। ফলে ১৬ই আগস্ট কলকতা শহরে রক্তের স্রোত বয়ে গেল,—সেদিন আবার অফিস-আদালতের ছুটি। কিছুক্ষণ মার খাবার পর হিন্দুরাও পাল্‌টা জবাব দেয়, আর দু'তিন দিন ধ'রে শহরের সর্বত্র চললো লুঠতরাজ আর গুণ্ডামী। যে আগুন কলকাতায় জ্বলেছিল সে আগুন সহজে নিভল না।

নোয়াখালি জেলায় হিন্দুর সংখ্যা কম, সারা জেলাটাই মুসলমান-প্রধান। জমি-জমা কিন্তু হিন্দুর অধিকারে। ১০ই অক্‌টোবর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন নোয়াখালির সর্বত্র হিন্দুজনতার ওপর আক্রমণ চলল।

প্রথমটা কোনো সংবাদ কলকাতায় আসেনি, সংবাদ এসে পৌঁছল সাত দিন পরে ১৭ই অক্‌টোবর। ঠিক সেই সময়েই খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীর কাছ থেকে অনুরোধ পেলেন নোয়াখালিতে স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবার। তাঁরা গিয়ে স্বচক্ষে অবস্থাটা দেখে আসবেন।

কলকাতায় দাঙ্গার পর থেকেই উনি অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা রোধ করার জন্য তাঁর চেষ্টার আর সীমা ছিল না। ১৮ই অক্টোবর সকালে এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে উনিও নোয়াখালি চলে গেলেন।

সময় খুবই অল্প ছিল, জয়ন্তীকে একটু আদর করলেন। তারপর সামান্য কিছু জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৈরী হলেন।

বাধা দেওয়ার কিছু ছিল না,—ওঁর মন আমার জানা। শুধু বললাম,—তোমার লেখার কিন্তু ক্ষতি হবে?

—লেখা? লেখা এখন রইল মিনতি! যারা এই সব কাণ্ড বাধিয়েছে তারাই আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু। হিন্দু বা মুসলমান কেউ-ই চায় না এই হানাহানি, নিরীহ মানুষের ওপর এই অত্যাচার, কিন্তু এও এক রকম হিস্টিরিয়া, যুদ্ধের সময় যে হিস্টিরিয়া থাকে দু'দলের সৈনিকের।

আর কিছু বললেন না, আমার মাথার চুলের ভেতর মুখ লুকিয়ে চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল।

আমি বললাম—তুমি সত্য ও সুন্দরের সাধনা কর, অথচ ছুটে চললে মৃত্যু আর মহামারীর ভেতর। এই তোমার ভালো লাগে, এতেই তোমার আনন্দ—আমার এ সব ভালো লাগে না, এ আমার সয় না।

উনি তবু নীরব। অবশেষে বললেন—ভয় পেয়োনা মিনতি! দেখছ না জীবনের কাছে মৃত্যু আর মহামারী কিছুই নয়।

—না—দেখছি না কিছুই; আমি দেখছি ওসব বীভৎস কাণ্ড, অতি ভয়ংকর, অতি কুৎসিত, আমার বিশ্রী লাগে—

—কারণ জীবনের ওপর তুমি মিথ্যা মূল্য চাপিয়ে বসে আছ। তোমরা জীবনটাকে একটা পর্ব হিসাবে নাও না, চূড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করো—তাই সে জীবনের অবসান ঘটে—কিন্তু আসল জীবন মৃত্যুহীন, অবিনশ্বর।

—ও সব তোমার সাহিত্যের কথা, মানুষের জীবনের সঙ্গেই সব শেষ। কিছুই থাকে না আর—

উনি বললেন—শোনো মিনতি !

ওঁর কাঁধের ওপর মুখ রেখে আমি মুখের দিকে তাকালাম। সেই স্পর্শ অনুভব করলাম, যে স্পর্শ একান্ত আমার, যে স্পর্শের প্রভাবে প্রথম দিন থেকেই আমি মোহিত হয়ে আছি—সেই স্পর্শ, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

বললাম—আমি কিছুই শুনতে চাই না।

উনি বলতে লাগলেন—তোমার মনে আছে ফ্ল্যাটবাড়িতে সেই রাত্রে তুমি যখন আমাকে 'রাঙা-কুঠির' কথা বলেছিলে আমি তা মেনে নিতে পারিনি ? কিন্তু একথা কি কোনোদিন ভেবেছ একবার যখন মেনে নিলাম তোমার কথা, তখন সব কেমন সহজ হয়ে গেল—। জীবন ও মৃত্যু ঠিক একই কথা, শুধু তাকে সহজভাবে নিতে হয়।

—কিসের সঙ্গে কি কথা ? আমি ও সব বুঝি না! তুমি কেবল হেঁয়ালিতে কথা বলো।

—এই অবস্থাও মেনে নিতে হবে। আজ নোয়াখালির ডাকে ছুটছি, কাল কোথায় যাব তারই বা ঠিক কি! সবই এই ঘর আর ঐ ঘর! রমানাথদা' বলেন —আমাদের জীবন সব কিছুর চাইতেও প্রবল এমন কি মৃত্যুর চেয়েও বড়!

আমি আবার বললাম—তা হতেই পারে না, মৃত্যুই শেষ।

উনি বললেন—তাই যদি হ'ত তাহ'লে আর একবার বসন্ত আসত না, কারণ জীবনকে ত' মৃত্যু নষ্ট ক'রে দেবে। মৃত্যু জীবনকে মারতে পারে না—জীবন একটা অখণ্ড বাস্তবতা। আজ যা হচ্ছে চারদিকে, তা মৃত্যুর চাইতেও কঠোর। এই এতবড যুদ্ধ গেল তারপর এই সব মারামারি আর কাটাকাটি। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে বসে আছি ব'লেই এত কষ্ট।

—আজ রাতে কি ক'রে তুমি এইসব কথা মুখে আনছ আমি ভাবতেই পারি না, আমি এর মধ্যে কোনো সৌন্দর্যই খুঁজে পাই না, কেবল দেখি বিভীষিকা আর জ্বালা, কষ্ট আর চোখের জল······

—ফ্ল্যাটবাড়ির কথা মনে কর, আমরা সন্ধ্যার পর কত কবিতা পড়তাম, মনে আছে ?

—না মনে নেই, সে কথা এনে এখন কথা চাপা দিচ্ছ তুমি।

উনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন, ওঁর হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট—

বললাম—কবিতা ? আত্মদান—সব মিথ্যা, সব ভুল। খ্রীস্টের বাণী, বুদ্ধের বাণী, কি তার দাম ? যিশুখ্রীস্টের আত্মদান ক'টা লোকের মনে আছে, তাহ'লে কি হ'ত এই বিরাট যুদ্ধ ? কিছুই নেই,—মানুষের কাছে কিছুই নেই।

উনি তবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আছে, কিছু আছে।

যেন মোটর কার কিংবা একখানা শাড়ি সম্পর্কে আলোচনা করছি এমনই নিস্পৃহ গলায় বললেন—আছে বিরাট বস্তু আছে, থাকবেও। সকল অভিজ্ঞতা নিয়েই ত' জীবন। যতক্ষণ না আমরা ভয় করছি, যতকাল তাকে মেনে নিয়ে চলতে পারব ততকাল সেই বিরাট বস্তুর বিরাটত্ব খর্ব হবে না। মৃত্যুর সঙ্গে মিশিয়ে আছে সেই মাধুরী, যা মৃত্যুর পরেও মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না—

—সব মিথ্যা। ওসব ছেলে-ভুলানো গল্প। ঘুম-পাড়ানি ওষুধ। এখন বুঝি, এ একরকমের আফিম।

এ কথার জবাব না দিয়ে উনি আমাকে তেমনই নিবিড় ক'রে ধ'রে রইলেন।

অনেক পরে বললেন—

—মহেশতলার সেই প্রথম রাতটা মনে আছে ? তুমি বলেছিলে—যেন অনেক দিনের চেনা মানুষকে আবার কাছে পেয়েছ, অনেক পরিচিত কথা মনে আসছে, অনেক দিনের কথা, অনেক ভুলে-যাওয়া কথা—

—তাতে কি ?

—আমি তোমাকে আগেও বলেছি, সময় নয়, অনন্ত কাল,—এই একটি মুহূর্ত অনন্ত মুহূর্ত,—এই সত্য। চরম সত্য। আজ আমি নোয়াখালি যাচ্ছি।

সাম্প্রদায়িক প্রীতি যাতে বাড়ে তার জন্য গান্ধিজী স্বয়ং আসছেন। দেখ মিনতি, অবিনশ্বর আত্মা আজ আর ম্যাজিক নয়, আজ তা চরম সত্য—

ওঁর মুখের সেই অদ্ভুত অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। দিগন্তে যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন সেই স্বপ্নের সন্ধানে চলেছেন। ওঁকে বাধার শক্তি আমার নেই।

সেই রাত্রে ওঁর পাশে শুয়ে ওঁরই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, যা জেনেছি তার হাত থেকে ত্রাণ নেই, নিষ্কৃতি নেই। নিদ্রাহীন নয়নে সারারাত সেইভাবে শুয়ে ছিলাম, পৃথিবীর সকল দুঃখ, সকল বেদনা যেন আমার দেহে এসেছে, সেই গুরুভার বহন করার শক্তি নেই, আমার চোখে সারা জগতের কান্না—

বিশাল সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গে ভাসছি।

ভোরের গাড়িতেই উনি নোয়াখালি চলে গেলেন।

বাইশ

অদ্ভুত অনুরোধ

আর সকলের মত আমাদের জীবনেও প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হয়েছিল বাহ্য ব্যাপারে আর আভ্যন্তরীণ জগতে; আর সকলের মতোই আমরাও—শোক, তাপ, নিঃসঙ্গতার দুর্ভোগ ভোগ করেছি। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের চোখে তা ধরা পড়েনি।

মাঝে মাঝে ভাবতাম এই রাঙা-কুঠিতে কখনও একা থাকতে পারব না, আবার একথাও ভেবেছি গোবিন্দলাল বাবুর এই বাড়ি ও তার আসবাব-পত্র আমাদের মনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, এ বাড়ি তিনি না বললে ছাড়বো না।

গোবিন্দবাবুও চলে এসেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা কাজ সেরে আবার ডিসেম্বরে যাবেন। নভেম্বরের শেষে আমাদের এখানে দেখা করতে এলেন।

আমার ভয় ছিল উনি বাড়িটা ছাড়তে বলবেন হয়ত, তাই যেদিন আমাদের দেখতে এসেছিলেন প্রসঙ্গতঃ কথাটা পাড়লাম।

গোবিন্দবাবু পাইপ মুখে দিয়ে বাগানে বসে ছিলেন। তাঁর চোখে একটা বিষাদভরা উদাস দৃষ্টি লক্ষ্য করলাম। ভাবছিলাম আমেরিকার বিলাসমণ্ডিত জীবন কি তাঁর ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি মুছে দেয়নি।

বললাম—আপনি যদি বাড়িটা চান, তাহ'লে আমাকে এখনই একটা ব্যবস্থা করতে হয়। আজকালকার বাজারে বাড়ি যোগাড় করা কত কঠিন শুনেছেন ত'?

উনি মাথা নাড়লেন—

বললেন—আমি বাড়ি ফেরত নিয়ে করব কি ?

—আপনি ত' আর আইয়োআ য়ুনিভার্সিটিতেই আটকে থাকবেন না, দেশে ফিরবেন ত', এই যেমন ফিরেছেন—

—ফিরব বটে, তবে আমার কাজকর্মের পক্ষে কলকাতায় থাকাই স্থবিধে,—যদি এক-আধ দিনের জন্য আসি, তোমরা কি আর থাকতে দেবে না ?—তারপর সোজা হয়ে ব'সে বললেন—তোমরা না চ'লে গেলে আমি তোমাদের হাত ধ'রে পথে বা'র ক'রে দেব না।

—আপনার স্থবিধে হ'লেই এখানে চ'লে আসবেন।

—আমি অবশ্য খুব বেশী জ্বালাতন করব না, তাছাড়া আমি আবার যে কবে আসব তাও জানি না।

—বুঝেছি,—আমি কালই জয়ন্তকে জানিয়ে দেব। শুনে নিশ্চয়ই খুসী হবেন।

—রোজই চিঠি দাও তাকে ? কোথায় আছে আজকাল ?

—এখন আছেন সীতারামপুর, গান্ধীজীও আছেন। সেখান থেকে অন্য কোনো গ্রামেও যেতে পারেন। গান্ধীজী সবাইকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিয়ে একা এক জায়গায় থাকতে চান।

গোবিন্দবাবু বললেন—ওতে লাভটা কি হচ্ছে আমি বুঝি না। আমি কোনো-দিনই গান্ধীবাদী নই, তা ছাড়া আমার এক বন্ধু সম্প্রতি নোয়াখালি থেকে ফিরেছেন। প্রেস-রিপোর্টার হিসেবে যুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরে ছিলেন। তিনি বললেন—নোয়াখালিতে মানুষে যা অত্যাচার করেছে তা যুদ্ধের সময় সিঙ্গাপুরে জাপানীরা যা করেছে তার চেয়ে ঢের বেশী বীভৎস, ক্ষতি ও সর্বনাশের কোনো তুলনা হয় না।

আমি বললাম—ক্ষতি হয়েছে নিশ্চয়ই, তবে গান্ধীজী এই ক্ষতির চাইতেও এর পিছনে যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে স্বচক্ষে তার ভিত্তি দেখতে চান এবং কিভাবে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায় তাই ভাবছেন !

গোবিন্দবাবু বললেন—ওদিকে বিহারীরা নোয়াখালি ডে ক'রে কি কাণ্ড করেছে দেখলে ত'! ছাপরার কাণ্ডটা বড কম নয়।

আমি বললাম—কিন্তু সেখানে কন্‌গ্রেসী সরকার রাশ ধ'রে আছেন, জহরলাল বলেছেন বোমা ফেলে গোলমাল থামাবেন।

—তা ত' থামাবেন, কিন্তু এর কি কোনো শেষ আছে? এখন স্বার্থপর মানুষ পরস্পরকে এগিয়ে দিয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে, মজা লুটবে ওপর তলার মানুষ। এর ফল বড় ভীষণ। জয়ন্ত সাহিত্য করত বেশ করত, এসব নিয়ে এবার মাতামাতি করতে গেল কেন?

—শুধু উনি ন'ন, খাদি প্রতিষ্ঠান, কন্‌গ্রেস, অভয় আশ্রম, আর. এস. পি., সব দলের ভলেণ্টিয়ার ওখানে কাজ করছে। আপনি ত' জানেন ইদানীং গান্ধী সেবাসঙ্ঘের কাজে উনি কি রকম মেতে উঠেছিলেন। নোয়াখালির পর আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না।

—কতদিন থাকবে কিছু লিখেছে? চাকরীর কি অবস্থা?

—থাকার কিছু ঠিক নেই, গান্ধীজী যেমন বলবেন সেইমত কাজ ক'রে যাবেন। আর চাকরী থেকে একরকম ছুটি, তবে 'নিজস্ব সংবাদদাতা' হিসাবে গান্ধীজীর ক্যাম্পের খবরাখবর পাঠান, তার জন্য কিছু দেয় অফিস থেকে।

—ভালো, একটা আদর্শ নিয়ে মেতেছে। কিন্তু সংসারধর্ম ফেলে এইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার তেমন প্রশংসা করতে পারছি না।

—কিন্তু আপনি যদি ওঁর এক-আধখানা চিঠি দেখেন, সেখানকার অবস্থা শুনলে আপনিও ক্ষেপে যাবেন।

—তোমাকে বুঝি সব জানায়, সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট পাঠায়? আর তুমি কি লেখ?

—আমিও এখানকার রিপোর্ট দিই। স্কুল-কলেজ ত্যাগ করার পর কলম ধরার কাজ ছেড়েই দিয়েছিলুম, এখন ওঁর জন্য প্রতিদিন কাগজকলম নিয়ে বসতে হয়।

—যদি হাত পাকাতে চাও, আমাকেও লিখতে পারো।

আমি সেই মুহূর্তে ওঁর মনের কথা বুঝলাম। নিঃসঙ্গ জীবনের ভার ব'য়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন গোবিন্দবাবু। মুখে বললাম—নিশ্চয়ই, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার বাজারে আমার আর কাজ কি ?

—আমার ত' তত সহজ মনে হয় না। তোমার কাজ তেমন হালকা নয়। এইভাবে সাহসে বুক বেঁধে ব'সে থাকা বড় কম কথা নয়।

তাঁর এই কথার অর্থ অনেকদিন পরে বুঝেছিলাম।

গোবিন্দবাবু—যাবার সময় বললেন—আমি যদি আর আমেরিকা থেকে না ফিরি, মিনতি, তাহ'লে এ বাড়ি তোমাদেরই,—

—কিন্তু বাড়ি ত' আর সে ভাবে পাওয়া যায় না, কিনতে হয়।

উনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন—পাগল, মিনতি, আমি চাই এ বাড়ি তোমাদের হোক্। তোমরা যদি কোনোদিন চলে যাও তাহ'লে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। তবে কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমি জয়ন্তকে এ বিষয়ে চিঠি দেব, সে বুঝবে—

লক্ষ্য করলাম, ওঁর চোখে জল। হয়ত স্ত্রী চলে যাওয়ার আগে ওঁর মনে যে সব স্বপ্ন ও আশা ছিল তার কথা ভেবেই কষ্ট পাচ্ছেন, বাকী জীবনটা তাই ব্রডওয়ে বা মিয়ামির উপকূলে কাটিয়ে দেবেন।

গোবিন্দবাবু শেষ কথা বললেন—আর তুমি যাবে কোথায় ? রাঙাদিদিমাকে তুমি ছাড়তে পারবে না, তিনিও তোমাকে ছাড়বেন না। আমি এ বাড়ির নাম 'রাঙা-কুঠি' দিলেও এ বাড়ি 'রাজা ঠাকুরের বাড়ি' জানো ত'।

আমার মনের মুকুরে শিরোমণি ঠাকুরের মূর্তি ভেসে উঠল। কর্তাদাদু তাঁকেই এই বাড়ি দিয়েছিলেন। এ কি অদ্ভুত অনুরোধ !

গোবিন্দবাবু চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ আমি সেই ভাবে গেট ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলাম, ভাবতে লাগলাম—ওঁর সব কথার অর্থ কি !

তেইশ

প্রত্যাবর্তন

নোয়াখালিতে গান্ধীজীর অবস্থান সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরা তেমন ভালো চোখে দেখছিলেন না। তাঁর প্রার্থনাসভায় মুসলিম শ্রোতার একান্ত অভাব দেখা গেল,—যে পথ দিয়ে তিনি যেতেন সে-সব পথ নোঙরা ক'রে রাখা হ'ত। তিনি অবশ্য এ সব উপেক্ষা করতেন,—গান্ধীজী নিজে যা বুঝেছেন তা'র থেকে তাঁকে এড়াতে পারে এ সাধ্য কার! তবু ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে যখন জানা গেল বিহারে গান্ধীজীর উপস্থিতির প্রয়োজন আছে তখন আর তিনি থাকতে পারলেন না। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে গান্ধীজী বিহার সফরে গেলেন আর উনি বাড়ি ফিরে এলেন।

উনি আসছেন এই খবর পেয়ে আমি সারা বাড়িটা বেশ পরিষ্কার ক'রে ফেললাম। নিজের হাতে সব কাজ করলাম, যদি তা না করতাম তাহ'লে আমার পক্ষে দিন কাটানো কঠিন হ'ত।

দিনের বেলা জয়তীকে নিয়ে কোনো রকমে কাটতো, রাতে কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসতো না চোখে।

পাঁচই মার্চ ১৯৪৭ উনি ফিরে এলেন। মাসিমা দেখতে এলেন মহেশতলা থেকে, সঙ্গে শেফালী ও শীলা। সকলেই মন্তব্য করল যে, ওঁর শরীর খুব খারাপ হয়েছে।

উনি জবাবে বললেন—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরতে হয়েছে দিনের পর দিন, উপযুক্ত আহার সব সময় জোটেনি।

যদিও কলকাতার আশেপাশে নোয়াখালির উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে সবাই অনেক কাহিনী শুনেছিল, তবু ওঁর কাছে শোনার জন্য অনেকে আসতেন প্রতিদিন।

উনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শুধু যে দৈহিক ক্লান্তি তা নয়, মনেও বেশ ক্লান্তি লক্ষ্য করলাম।

কিছু কাজে মন নেই, নিয়ম ক'রে অবশ্য 'নবভারত' অফিসে যেতেন, কিন্তু 'মহেশতলা ভবনে' যাওয়ার উৎসাহও যেন তাঁর নেই। অসমাপ্ত উপন্যাস শেষ করার দিকেও আগ্রহ নেই। নোয়াখালির ডাইরী লিখে এনেছেন, 'নবভারতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে।

এই কয় মাসেই ওঁর যেন বয়স অনেক বেড়ে গেছে,—আমাদের বাইরের ঘরে উনি অনেক সময় চুপ ক'রে বসে থাকতেন। আমি ভাবতাম এই ঘরেই একদিন রমানাথদা', সোমনাথ, গোবিন্দবাবু ও উনি কত তুমুল তর্ক চালিয়েছেন। আজ হয়ত সেই অতীতের স্মৃতির রোমন্থন করছেন।

এপ্রিল মাসের শেষাশেষি। গান্ধীজী তখন দিল্লী থেকে বিহারে আবার ফিরেছেন, এদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রচণ্ড দাঙ্গা সুরু হ'ল। দেশ-বিভাগের কথা লোকের মুখে মুখে শোনা যেতে লাগল।

সকাল বেলা খবরের কাগজে এইসব প'ড়ে উনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। একদিন বললেন—জানো মিনতি,—দেশ স্বাধীন হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার আগে হাজার হাজার মানুষের জীবন যাবে, এ জীবন সামনাসামনি যুদ্ধ ক'রে যাবে না, পশুর মতো তাদের বলিদান দেওয়া হচ্ছে, এই কথা ভেবেই আমার কষ্ট। বৃটিশরা ভারত ছাড়বে সন্দেহ নেই, তার আগে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে এ আগুন নিভতে অনেক সময় লাগবে।

আমি বললাম—ভাগাভাগি হোক আর যাই হোক, তাড়াতাড়ি হাঙ্গাম মিটলেই বাঁচি।

মে মাসের গোড়ায় গান্ধীজী আবার সোদপুরে এলেন। নোয়াখালির গোলমাল তখনও মেটেনি, কলকাতায় এদিক-ওদিকে দু'একটা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু গান্ধীজী দিন পনেরো থেকেই আবার পাটনায় ফিরে গেলেন। উনিও ক'দিন সোদপুরে থেকে আবার বাড়ি ফিরে এলেন।

ওঁর কাছেই প্রথম শুনলাম দেশ-বিভাগের ব্যবস্থা একরকম স্থির হয়ে গেছে। এখন খুঁটিনাটি বিষয়গুলি স্থির হতে যা বাকী।

সে রাতেও আমরা আবার বাগানে শুয়েছিলাম। প্রথম যেবার এখানে এসেছিলাম তখন এমনই বাইরে শুয়েছিলাম কয়েক দিন। নৈশ বাতাসে ওঁর দেহ বেশ ঠাণ্ডা মনে হ'ল, আমি সস্নেহে ওঁর কপালে হাত বুলিয়ে দিলাম।

মাঝ রাতে ঝড় উঠল—সেই সঙ্গে বৃষ্টি। রাত তখন দেড়টা বেজেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা, খাটিয়া সব আবার চণ্ডীমণ্ডপে টেনে আনা হ'ল।

উনি খাটিয়ার উপর উঠে ব'সে বাইরে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললেন—জানো মিনতি, শুনলে হয়ত হাসবে, কিন্তু একটা কথা ভাবতে মজা লাগে। সারা ভারতে, এমনই ছোট ছোট কত ঘর বাড়ি আছে, সে বাড়িতেও ছোট ছেলেমেয়ে ঘুমোয়—সেখানেও বৃষ্টি পড়ে—। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমরা সবাই তাই চাই। আমি নোয়াখালিতে সব দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। পাঞ্জাবী, বিহারী, গুজরাটি, মারাঠি, সবায়ের মুখে সেই এক কথা, 'বাড়িতে আমাদের একটা বিড়াল বা কুকুর আছে'—'মা যা রান্না করেন—', 'আমাদের বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড গাছ—' কথা বিভিন্ন, লোক বিভিন্ন। কিন্তু কি জানো মোদ্দা কথা সেই এক—ব্যক্তিগত ভাবে আমরা সবাই চাই শান্তি আর যৌথভাবে চাই যুদ্ধ।

আমি বললাম—তার মানে? নোয়াখালির মুসলমানরাও শান্তি চায়?

—চায় বৈ কি, কিন্তু তারা অশিক্ষিত, দরিদ্র, ধর্মান্ধ; তাদের যেমনটি বুঝিয়েছে, তারা ঠিক তাই বুঝেছে।

—তাই মানুষগুলোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে।

—সে কি আর তারা? তখন তারা অন্যজন। দলে পড়লে মানুষের কি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

—তা থাকে না, সেইখানেই ত' আমার ভয়।

—ভয় কিসের! মরতে আমি ভয় পাই না মিনতি, যদি সে মরণে কারো মঙ্গল হয়। পৃথিবীর কল্যাণে মরা ভালো, জীবনের জন্য মরা। কিন্তু আমি মরবো আর ঝুনঝুনওয়ালার ভুঁড়ি বাড়বে, কিংবা আমি জীবনটা নষ্ট করবো আর কোনো সামাজিক জীব শুধু একটা শাড়ি কিনেই আমার একমাসের রোজগার নষ্ট করবে, তার জন্য মরতে রাজী নই—

—থামো—থামো—।

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলেন উনি। তারপর বললেন—থামবো কেন? ভয় করছে?

—ভয় নয়, কিন্তু ও আমার সয় না, মরার খবর ত' চারদিকে, আবার এই মাঝরাতে সে সব কথা কেন?

উনি কাছে এগিয়ে এসে আমার হাতটা তুলে নিয়ে বললেন—

—কথাটা শোনো মিনতি,—কথা শুনতে কি তোমার আপত্তি?

—না, আমাকে ও সব শোনাতে হবে না! অনেক শুনেছি—।

—শোনা কিন্তু উচিত,—অনেক কথা তোমাকে বলার ছিল।

—কি কথা!

উনি আমার বিছানার প্রান্তে ব'সে বললেন—জানো মিনতি, এই দাঙ্গায় এমন সব ব্যাপার ঘটছে যা কোনো আইনেই সমর্থন করা চলে না!

আমি প্রশ্ন করলাম—কি কথা? তুমি কি আবার নোয়াখালির কথা বলছ?

—একটা ছোট্ট ঘটনা বলি শোনো, জানুয়ারী মাসে জগৎপুরে মহিলাদের সভায় মহাত্মাজী সাহস সম্পর্কে কিছু বলছিলেন। একটি স্ত্রীলোক এই সভায় তাঁর স্বামীর দেহের একখণ্ড হাড় সংগ্রহ ক'রে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর স্বামীকে খুন ক'রে ওরা কবর দিয়েছিল। একবার অবস্থাটা বিবেচনা করো দেখি। দেখ সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে, এই চরম দুঃসময়ে মুসলমান মেয়েরাও হিন্দু মেয়েদের দুর্দশায় এতটুকু ব্যথা পায়নি। তাই মনে হয় মানুষের পরিবর্তন ঘটছে। সবাই হয়ত নয়—কিন্তু যুদ্ধ আর মন্বন্তর মানুষকে পশু ক'রে দিয়েছে। তবে একটা নতুন সাড়া জাগবে, তুমি দেখে নিয়ো—

—আমি ভাবতে লাগলাম—কি উনি বলতে চান! নতুন সাড়াই বা কি!

বললাম—কি যে বলছ বুঝছি না। তোমার নোয়াখালির গল্প থামাও।

—আমার কি মনে হয় জানো মিনতি, এই অবস্থা হ'ল একেবারে শেষের অবস্থা, পুরাতন পৃথিবীর শেষ হয়ে এসেছে। এটম বোমা মেরে একটা দেশ উড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ, সে আর এক কষ্ট। কিন্তু যেখানে খাঁচায় পোরা পশুর মতো মানুষকে মানুষ পুড়িয়ে মারছে, কিংবা স্ত্রীলোকের সম্মান নষ্ট করছে, ধর্মের নামে কি বীভৎস উন্মত্ততা! অথচ এর মূলে আছে অভাব। তাই মনে হয় নতুন পৃথিবী আসছে, পুরাতন পৃথিবীর শেষ হয়ে এসেছে।

—থাক্‌গে, তোমার নতুন পৃথিবী যখন আসবে তখন দেখা যাবে, এখন এই রাত দেড়টার সময় নতুন পৃথিবীর অঙ্ক কষতে আর ভালো লাগে না। এখন যারা মরবার তারা ত' মরছে, তাদের কষ্টের শেষ কই—

—জানি না—তবে জানা উচিত ছিল আমার।

আমি সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের রাতেও কেঁপে উঠলাম, একটা শীতল ছায়া আমার দেহের ওপর প্রবাহিত হ'ল।

আমি আবার বললাম—দেখ এসব আলোচনা এখন থাক, আমার খুব ভালো লাগছে না—

—তুমি যে ভালো লাগাতে চাও, তা জানতাম না।

আমি প্রায় কেঁদে ফেলতাম—তবু ওঁকে বুঝিয়ে দিলাম—দেখছ না, আমার ভয় হয়। ওসব কথা চিন্তা করতেও আমার ভয়।

—বুঝেছি, সেইজন্যই ত' তোমার কাছে এত ক'রে জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করি। যতক্ষণ ভয়েব কাছাকাছি না আসি ততক্ষণই ভয়; মৃত্যুকে এত ভয় কেন, মৃত্যুর* মুখেব দিকে তাকাতে আমরা নারাজ তাই। দেখছ না মিনতি,—এ আর একটা অভিজ্ঞতা। এই ত' বাস্তবতা।

বললাম—বাস্তবতা! কে তোমার এই বাস্তবতা চায়, কে চায় এই অমৃত-লোকের সন্ধান। আমি ত' চাই না, আমি শুধু তোমাকে চাই।

—সেই কথাই ত' বলছিলাম, আমি ত' আছি। আমি আর যাচ্ছি কোথায়?

আমি বললাম—দেখ আমি কবি নই, রাজনীতি আমার পেশা নয়। আমি মেয়ে মানুষ। লেখাপড়াই শিখি আর যাই করি আমি সেই মেয়ে মানুষ। আমাদের চোখে এই ভয়ংকর অবস্থা আর সয় না। এই সব হানাহানি যদি না থামে তাহ'লে—কোনো কিছুরই মূল্য নেই। স্বাধীনতারও কোনো দাম থাকবে না। আমি অন্ততঃ তাই বুঝি।

আমি কাঁদছিলাম, আমার দু'চোখ দিয়ে বন্যাস্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়ছে—কিছুতেই সে কান্না থামাতে পারলাম না।

উনি বললেন—মাঝে মাঝে তুমি সত্যেব কাছাকাছি এসে পড়; সেইটুকু আমার ভালো লাগে। দেখ, বৃষ্টি থেমে গেছে—

বৃষ্টি থেমে গেছে। ভিজে মাটিতে একটা সোঁদা গন্ধ। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মধ্যরাত্রের স্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আমবা সেইভাবে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলাম।

চব্বিশ

আছে দুঃখ

আমার কাহিনী শেষ হয়েছে। হয়ত আগের পরিচ্ছেদেই থেমে গেলেও চলত। কিন্তু আজ পনেরই আগস্ট, প্রথম স্বাধীনতা-দিবস। সংবাদপত্রে দেখছি নাখোদা মসজিদে হিন্দুদের মাথায় গোলাপজল ছিটানো হয়েছে, হিন্দুরাও রসগোল্লা বিতরণ ক'রে মুসলমানদের আলিঙ্গন করছেন। চতুর্দিকে একটা মহামিলনের স্রোত বইছে।

কিন্তু আজ এই আনন্দের আস্বাদ থেকে জয়ন্ত বঞ্চিত হয়ে রইলেন। মহম্মদ আলি পার্কের মিটিংএর পর ২রা আগস্ট উনি 'শান্তিসেনা'র নেতৃত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন একদল শান্তিপ্রিয় মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে ক'রে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে। 'হিন্দু মুসলমান এক হো' ছিল ওঁদের মন্ত্র। কিন্তু সেই মুসলমান বন্ধুগণ যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেও উন্মত্ত জনতার হাত থেকে ওঁকে বাঁচাতে পারেনি। আমার কাছে ফিরে এসেছিল ওঁর ঘুমন্ত দেহটা।

নোয়াখালির জগৎপুরের সেই স্ত্রীলোকটির কথা আমার মনে পড়েছিল সেই দিন। কেন সে মৃত স্বামীর হাড় নিয়ে ঘুরেছিল, আজ তা বুঝতে পারছি। পুরীর সমুদ্রতীরের সেই মুসলমান ভদ্রলোক এখন কোথায়?

রাজপথে হল্লা শোনা যাচ্ছে। এই পল্লীপ্রান্তেও ছেলের দল নিশান নিয়ে ছুটছে, আজ স্বাধীনতা-দিবস।

আমিও এইখানেই শেষ ব'লে গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু তবু জানতাম এই শেষ নয়, শেষের মধ্যে আছে অশেষ। প্রবীর চক্রবর্তী বলেছিলেন—সেই আলো, অনির্বাণ আলোর কথা। সে আলোর শেষ নেই।

মালতী মাসিমা খবরটা শুনেছিলেন সর্বপ্রথম, তিনি দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমি তখনই বুঝেছিলাম, তাঁকে আঁচড়ে কাঁমড়ে আমি ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম,—মাসিমা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বাড়িতে ফিরে এসে অনেকখানি শক্ত হয়ে ছিলাম। জয়ন্তীকে বুকে চেপে ধ'রে ঠিক করেছিলাম, এমন ক'রে ভেঙে পড়লে চলবে না। মেয়েটার জন্য আমাকে দাঁড়াতে হবে, কাজ করতে হবে। অতীতের সব চিন্তা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে।

ভুলে গিয়েছিলাম প্রবীর চক্রবর্তীর কথা,—জীবন তোমার মুখের পানে না তাকিয়ে সোজা নিজের পথে চলে যাবে।

প্রতি রাতে মহেশতলা ভবনের কেউ না কেউ এসে অনেকক্ষণ থাকতেন। শেফালী আর শীলা যেন পাথর হয়ে গেছে! শেফালীর মুখে আর সে চাঞ্চল্য নেই। শীলা কেবল আমাকে নজরে রাখে। সময় পেলেই রবীন্দ্রনাথের গান শোনায়—

'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু—'

রাতের বেলা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতাম, ভাবতাম বিস্তীর্ণ নদীর মতো জীবনটা পড়ে রইল সামনে—নিস্তরঙ্গ নদী।

অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে চলেছি, কোথায় যে ভেসে চলেছি কেউ জানে না,—

মনে হয় আমি ঘুমিয়েছিলাম,—মনে মনে অন্ততঃ ভাবি আমি ঘুমিয়েছিলাম,—ঠিক যে কি অবস্থা মনে নেই, জানার প্রয়োজনও নেই,—

মনে হ'ল সহসা আমার ঘুম ভেঙে গেছে, পরিষ্কার চোখ মেলে শুয়ে আছি,